বাংলাপিডিএফ.নেট পরিবেশিত

হুমায়ূন আহমেদ

ফেরা

স্ক্যান ও এডিটঃ মারুফ
বাংলাপিডিএফ.নেট
MARUF
fb.com/groups/Banglapdf.net
Visit Banglapdf.net for
More HQ Ebooks
PLEASE DO NOT SHARE THE BOOK
WITHOUT OUR COURTESY

ফেরা

মতি মিয়া দ্রুত পায়ে হাঁটছিল।

আকাশ অন্ধকার হয়ে আছে। যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। সঙ্গে ছাতা ফাতা কিছুই নেই। বৃষ্টি নামলে ভিজে ন্যাতা ন্যাতা হতে হবে। মতি মিয়া হনহন করে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ছেড়ে সোহাগীর পথ ধরল। আর তখনই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। মতি মিয়ার বিরক্তির সীমা রইল না। সকাল সকাল বাড়ি ফেরা দরকার। শরিফার পা ফুলে ঢোল হয়েছে। কাল সারা রাত কোঁ কোঁ করে কাউকে ঘুমাতে দেয়নি। সন্ধ্যার পর আমিন ডাক্তারের এসে দেখে যাওয়ার কথা। এসে হয়তো বসে আছে। মতি মিয়া গম্ভীর একটা ঝাঁকড়া জামগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল।

দেখতে দেখতে বৃষ্টির বেগ বাড়ল। ঢালা বর্ষণ, জামগাছের ঘন পাতাতেও আর বৃষ্টি আটকাচ্ছে না, দমকা বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ। দিনের যা গতিক, ঝড়-তুফান শুরু হওয়া বিচিত্র নয়। দাঁড়িয়ে ভেজার কোনো অর্থ হয় না। মতি মিয়া উদ্বিগ্ন মুখে রাস্তায় নেমে পড়ল। পা চালিয়ে হাঁটা যায় না। বাতাস উল্টোদিকে উড়িয়ে নিতে চায়। নতুন পানি পেয়ে পথ হয়েছে দারুণ পিছল। ক্ষণে ক্ষণে পা হড়কাচ্ছে। সরকারবাড়ির কাছাকাছি আসতেই খুব কাছে কোথায় যেন প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। আর আশ্চর্য, বৃষ্টি থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মতি মিয়া অবাক হয়ে শুনল সরকারবাড়িতে গান হচ্ছে। কানা নিবারণের গলা বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যেও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে—

আগে চলে দাসী বান্দি পিছে ছকিনা,
তাহার মুখটি না দেখিলে প্রাণে বাঁচতাম না
ও মনা ও মনা...

সরকারবাড়ির বাংলাঘরের দরজা জানালা বন্ধ। মতি মিয়া ধাক্কা দিতেই নাজিম সরকার মহাবিরক্ত হয়ে দরজা খুললেন। হ্যাঁ, কানা নিবারণই গাইছে। সেই গাট্টা চেহারা, পান খাওয়া হলুদ রঙের বড় বড় কুৎসিত দাঁত। কানা নিবারণ গান থামিয়ে হাসিমুখে বলল, মতি ভাই না? পেন্নাম হই। অনেকদিন পরে দেখলাম।

মতি মিয়া বড়ই অবাক হলো। কানা নিবারণের মতো লোক তার নাম মনে রেখেছে। জগতে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। কানা নিবারণ গম্ভীর হয়ে বলল, মতি ভাইরে একটা গামছা টামছা দেন।

কেউ গা করল না। নাজিম সরকার রাগী গলায় বললেন, ভিজা কাপড়ে ভিতরে আসলা যে মতি? দেখো ঘরের অবস্থা কী করছ? তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আর হইল না। ছিঃ ছিঃ।

কানা নিবারণ বলল, ঘরে না আইসা উপায় কী ? বাইরে ঝড় তুফান।

নাজিম বড়ই গম্ভীর হয়ে পড়লেন। থেমে থেমে বললেন, তুমি গান বন্ধ করলা কেন নিবারণ ?

কানা নিবারণ সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু করল—

দুধের বরণ সাদা সাদা কালা দিঘির জল
তাহার মনের গুপ্ত কথা আমারে তুই বল।

মনটা উদাস হয়ে গেল মতি মিয়ার। শরিফা বা আমিন ডাক্তার কারও কথাই মনে রইল না। কন্যার মনের গুপ্ত কথাটির জন্যে তারো মন কাঁদতে লাগল। আহা এত সুন্দর গান কানা নিবারণ কী করে গায় ? কী গলা!

গান থামল অনেক রাতে। ততক্ষণে মেঘ কেটে আকাশে পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে। গাছের ভেজা পাতায় চকচক করছে জ্যোৎস্না। মতি মিয়া উঠানে নেমে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না এমন অদ্ভুত লাগে। বিড়ি টানতে টানতে নিবারণ বাইরে আসতেই মতি মিয়া বলল, কেমন চাঁদনি রাইত দেখছেননি নিবারণ ভাই ?

'চাঁদনি রাইত' নিবারণকে তেমন অভিভূত করতে পারল না। বিড়িতে টান দিয়ে সে প্রচুর কাশতে লাগল। কাশির বেগ কমে আসতেই গম্ভীর হয়ে বলল, বাড়িত যান মতি ভাই, রাইত মেলা হইছে।

আর 'গাওনা' হইত না ?

নাহ আইজ শেষ। ওখন বেশি গাই না। বুকের মধ্যে দরদ হয়।

ডাক্তার দেখান নিবারণ ভাই।

নিবারণ বিরক্ত মুখে একদলা থুথু ফেলে চোখ কুঁচকে বলল, বাড়িতে যান। আমার ডাক্তার লাগে না।

রাস্তায় নেমেই মতি মিয়া লক্ষ করল আবার মেঘ করেছে।

দক্ষিণ দিকে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চৌধুরীবাড়ির কাছাকাছি আসতেই দুই পহরের শেয়াল ডাকল। এতটা রাত হয়েছে নাকি ? চারদিক নিশুতি। চাঁদ মেঘের আড়ালে পড়ায় ঘুটঘুটি অন্ধকার। গা ছমছম করে।

কেডা, মতি নাকি ?

মতি মিয়া চমকে দেখে ছোট চৌধুরী। উঠোনে জলচৌকি পেতে খালি গায়ে বসে আছেন। ইনার মাথা পুরোপুরি খারাপ। গত বৎসর কৈবর্তপাড়ার একটা ছেলেকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন।

কে, একটা কথা কয় না যে ? মতি নাকি ?

জি।

এত রাইতে কই যাও ?

বাড়িত যাই।

তোমার বড় পুলাডা তোমারে খুঁজতেছে। তোমার বৌয়ের অবস্থা বেশি বালা না। নীলগঞ্জে নেওন লাগব।

জি আচ্ছা।

জি জি করো কেন মতি মিয়া ? তাড়াতাড়ি বাড়িত যাও।

মতি মিয়া তবু দাঁড়িয়ে থাকে। ছোট চৌধুরীর অভ্যাস হচ্ছে, ভালো মানুষের মতো কথা বলে হঠাৎ তাড়া করা। সে কারণেই হুট করে সামনে থেকে চলে যেতে ভরসা হয় না।

ছোট চৌধুরী গর্জন করে ওঠেন।

কথা কানে ঢোকে না ? থাপ্পড় দিব, ছোটলোক কোথাকার। যা—বাড়িত যা।

মতি মিয়া বাড়ি ফিরে দেখে আমিন ডাক্তার বসে আছে। শরিফার জ্ঞান নেই। আজরফ চুলা ধরিয়ে কী যেন জ্বাল দিচ্ছে।

আমিন ডাক্তার বলল, অবস্থা বড় সঙ্গিন। রাইত কাটে কি না সন্দেহ।

মতি মিয়া কিছু বলল না। যেন সে আমিন ডাক্তারকে দেখতেই পায়নি। আজরফের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় ধমক দেয়, অত রাইতে কী জ্বাল দেস ?

চা। আমিন চাচা চায়ের পাতা আনছে।

আমিন ডাক্তার মৃদুস্বরে বলল, সারা রাইত জাগন লাগব, চা ছাড়া জুইত হইত না। বুঝছনি মতি, নীলগঞ্জ নেওন লাগব।

আমিন ডাক্তার লোকটি ভীতুপ্রকৃতির। রোগীর অবস্থা একটুখানি খারাপ দেখলেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে নীলগঞ্জ নেওয়ার জন্যে, বারবার বলে, রাইত কাটা সম্ভব না। রাইতের মধ্যেই ভালো মন্দ হইতে পারে।

কিন্তু আজ রোগীর অবস্থা সত্যি খারাপ। আমিন ডাক্তার চিন্তিত মুখে ক্রমাগত হুকা টানে। মতি মিয়া বিরক্ত হয়ে বলে, মেয়েমানুষের মতো বেআক্কেল জিনিস খোদার আলমে নাই, বুঝলা ডাক্তার ?

ডাক্তার হুকা টানা বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে বলে, নীলগঞ্জ নেওনের ব্যবস্থা করো মতি।

কইলেই তো ব্যবস্থা হয় না! যোগাড়যন্ত্র লাগে। সকাল হউক। টেকাপয়সার যোগাড় দেখি।

আইজ রাইতেই নেওন লাগব মতি।

মতি মিয়া কথা না বলে খেতে বসে। আজরফ ভাত বেড়ে দেয়। ভাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গেছে। কাঁচামরিচে ঝালের বংশ নাই। মতি মিয়া আধপেট খেয়েই

হাত ধোয়। ছোট ছেলে নুরুদ্দীন আমিন ডাক্তারের গা ঘেঁসে বসে ছিল। সে দীর্ঘ সময় বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সাহস করে বলে ফেলে, আমারে নীলগঞ্জ নেওন লাগব বাজান।

বহু কষ্টে রাগ সামলায় মতি মিয়া। আমিন ডাক্তার বলে, চা খাও একটু মতি। আজরফ তর বাপরে চা দে।

আমারে দিস না।

আরে খাও। বালা চা। মোহনগঞ্জের খরিদ।

নীলগঞ্জ যাওয়ার যোগাড় যন্ত্র করতে অনেক সময় লাগে। বাঁশের যে খুঁটিতে পয়সা জমানো হতো সেটি কাটা হয়। সব মিলিয়ে সাত টাকার মতো পাওয়া যায় সেখানে। এতটা মতি মিয়া আশা করেনি। আজরফ চলে যায় নৌকার ব্যবস্থা করতে। ঠিক হয় আজরফ-নুরুদ্দীন দুজনেই সঙ্গে যাবে। আমিন ডাক্তারও যাচ্ছে। নীলগঞ্জ হাসপাতালের কম্পাউন্ডার সাহেবের সঙ্গে তার নাকি ভালো জানাশোনা। আপনি আপনি করে কথা বলে।

খালি বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে আনা হয়েছে রহিমাকে। রহিমার মেয়েটি কাঁদছে গলা ফাটিয়ে। শরিফার জ্ঞান ফিরেছে। সে বিড়বিড় করে কী যেন বলে ঠিক বোঝা যায় না। মতি মিয়া কড়া ধমক লাগায়, চুপ। একদম চুপ। বেআক্কেল মেয়েমানুষ।

শরিফা চুপ করে যায়। আমিন ডাক্তার এক ফাঁকে বলে, আমারে যে সাথে নিতাছ সেই বাবদ দুই টেকা ভিজিট—কথাডা স্মরণ রাখবা মতি।

মতি মিয়া দারুণ বিরক্ত হয়।

তোমারে সাথে নেওনের কথা তো কই নাই। নিজের ইচ্ছায় তুমি যাইতাছ।

আমিন ডাক্তার চুপ করে যায়।

নৌকায় উঠবার মুখে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। ছইয়ের নিচে খড় বিছিয়ে শরিফার বিছানা। শরিফার গায়ের সঙ্গে সেঁটে লেগে থাকে নুরুদ্দীন। ডাক্তার বসেছে নৌকার সামনের মাথায়। এর মধ্যেই সে ভিজে চুপসে গেছে। তার সঙ্গে ছাতা আছে। কিন্তু রোগী নিয়ে কোথাও যাওয়ার সময় ছাতা মেলতে হয় না। খুব অলক্ষণ। নৌকাতে দুটি মুরগি এবং একটি পাকা কাঁঠাল নেওয়া হয়েছে। নীলগঞ্জ বাজারে ভালো দাম পাওয়া যাবে।

মুরগি দুটি অনবরত ডানা ঝাপটায়। ডাক্তার গম্ভীর হয়ে হুক্কা ধরায়। বৃষ্টির ছাঁট থেকে কলকে আড়াল করে রাখতে তাকে অনেক কায়দা-কানুন করতে হয়। পাকা কাঁঠালের গন্ধের সঙ্গে তামাকের গন্ধ মিশে অদ্ভুত একটা মিশ্র গন্ধ তৈরি হয়। তুমুল বর্ষণের মধ্যে নৌকা ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আজরফ টপাটপ বৈঠা মারে। মতি মিয়ার বড় মায়া লাগে।

শীত লাগে আজরফ ?

নাহ।

মাথাডা গামছা দিয়া বাঁধ। মাথা শুকনা থাকলে সব ঠিকঠাক। বুঝছস ?

বুঝছি।

বৈশাখ মাসের বিষ্টির মজাটা কী জানসনি আজরফ ?

না।

মজাটা হইল অসুখবিসুখ হয় না। সব আল্লাহর কেরামতি।

আজরফ কথা বলে না। ছৈয়ের ভেতর থেকে শরিফা বিড়বিড় করে কী যেন বলে। অসহ্য বোধ হয় মতি মিয়ার।

কী কও ?

পুলাডা ভিজতাছে।

দুত্তেরি মেয়েমানুষ। বিষ্টির সময় ভিজত না ?

অসুখ করব।

চুপ থাক মাগি, খালি প্যানপ্যানানি।

আমিন ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলে, মেয়েজাতের সাথে এইসব গালিগালাজ করা ঠিক না মতি।

তুমি ফরফর কইরো না, চুপ থাকো।

আমিন ডাক্তার চুপ করে যায়। ছপছপ বৈঠা পড়ে। ছৈয়ের ভেতর থেকে মুরগি দুটির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ আসে। দূরের সোনাপোতার হাওরের দিক থেকে হঅ হঅ শব্দ হয়। গা ছমছম করে আজরফের। নৌকা এখন বড় গাঙ্গে পড়বে। জায়গাটা খারাপ। গাঙ্গের মুখটাতেই তিনটি প্রকাণ্ড শ্যাওড়াগাছ। রাতে নাম নেওয়া যায় না এমন সব বিদেহী জিনিসের খুব আনাগোনা।

নৌকা নীলগঞ্জে পৌঁছল দুপুরের পর। মতি মিয়ার নড়বার শক্তি নেই। একনাগাড়ে নৌকা বেয়ে সমস্ত শরীর কালিয়ে গেছে। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ার চিন্তা ছাড়া তার মাথায় এখন আর কিছু ঢুকছে না। আমিন ডাক্তার একাই গেল হাসপাতালে খোঁজ নিতে। ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এল মুখ কালো করে। হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব গেছেন ছুটিতে। কখন আসবেন কেউ জানে না। কম্পাউন্ডার সাহেবের মেয়ের বিয়ে। তিনি গেছেন বাঁশখালী। বিষ্যুৎবার নাগাদ আসবার কথা। মতি মিয়ার কোনো ভাবান্তর হলো না। সে গম্ভীর মুখে বলল, চেষ্টার তো কোনো ত্রুটি করি নাই, কী কও ডাক্তার ? কপালের লিখন না যায় খণ্ডন। করনের তো কিছু নাই।

আমিন ডাক্তার চুপ করে থাকল। মতি মিয়া বলল, খাওয়া-খাইদ্য শেষ কইরা চলো বাড়িত যাই।

মতি ভাই, চলো মিশনারি হাসপাতালে লইয়া যাই। বেশি দূর না, একটা মুটে হাওর পরে। সোনাদিয়া হাওর।

আমিন ডাক্তারের কথা শেষ হওয়ার আগেই মতি মিয়া ঝাঁঝিয়ে উঠে, এইসব খিরিস্তানীর মইধ্যে আমি নাই। এইসব কথা মুখে আইন্য না, বুঝলা।

আমিন ডাক্তার চুপ করে যায়। শরিফারও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। জারুল গাছের ছায়ায় নৌকা বেঁধে ভরপেট চিড়া খেয়ে মতি মিয়া ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙে সন্ধ্যার পর। নৌকা তখন সোনাদিয়ার হাওরে পড়েছে। পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। পাল খাটানো হয়েছে। আমিন ডাক্তার হাল ধরে বসে আছে। ভাবখানা এরকম যেন কিছুই জানে না।

মতি ভাই, বাতাসের এই ধরনের জোর থাকলে এক পহরেই মিশনারি হাসপাতালে পৌঁছোন যাইবে।

মতি মিয়া চুপ করে থাকে।

তামুক খাইবা নাকি, কী ও মতি ভাই ?

নাহ।

মিশনারি হাসপাতালে একবার নিয়া ফেলতে পারলে বুঝলা আর চিন্তা নাই। হেইখানে নিখল সাব ডাক্তার খুব এলেমদার লোক।

মতি মিয়া চুপ করে থাকে। আড়চোখে দেখে আজরফ কাল রাতের পরিশ্রমে কাহিল হয়ে মরার মতো ঘুমাচ্ছে। শরিফার মুখের কাছে ভনভন করে মাছি উড়ছে একটা। মরে গেছে নাকি ? মরলেই কী আর বেঁচে থাকলেই কী ? হাওরের দিগন্তবিস্তৃত কালো পানির দিকে তাকিয়ে মনটা উদাস হয়ে যায় তার। জগতসংসার তুচ্ছ বোধ হয়। সে চাপাস্বরে গুনগুন করে,

লোকে আমায় মন্দ বলে রে
মন্দ বলে মন্দ বলে মন্দ বলে রে
আমি কোথায় যাব কী করিব
দুঃখের কথা কাহারে কব রে।
মন্দ বলে মন্দ বলে মন্দ বলে রে।

আমিন ডাক্তার মৃদুস্বরে বলে, তুমি কিন্তু বড় গাতক মতি ভাই।

মতি মিয়া পাঁচদিন পর গয়নার নৌকায় ফিরে এল।

সঙ্গে নুরুদ্দীন। নিখল সাব ডাক্তার (রিচার্ড এ্যালেন নিকলসন) বলেছেন সারতে সময় নেবে। অবস্থা ভালো না। কাটাকুটি করতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মাসখানেক লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়।

আমিন ডাক্তারের নাকি তেমন কাজকর্ম নেই। সে নিজেই দায়িত্ব নিয়েছে সব ঠিকঠাক করিয়ে নিয়ে আসবে। মতি মিয়া অবাক হয়ে বলেছে, একমাস যদি থাকন লাগে তুমি খাইবা কী ?

হইব একটা ব্যবস্থা। রোগী ফালাইয়া তো যাওন যায় না।

ব্যবস্থা যে কী হবে মতি মিয়ার মাথায় আসে না। আমিন ডাক্তারের কাছে আছে সর্বমোট সাড়ে ন' টাকা। কিন্তু আমিন ডাক্তারকে মোটেই বিচলিত মনে হয় না। আজরফকে অবশ্যি নিখল সাব বাসায় কাজ দিয়েছেন। নদী থেকে সে গোসলের পানি তুলে আনে। বিকালে হাসপাতালের মেঝে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে হয়। যত ঘষাঘষিই করা হোক সাহেবের পছন্দ হয় না। মাথা নেড়ে বলেন, আরও ভালো করো। জোরে ব্রাশ করো।

খাওয়াদাওয়া সাহেবের এখানেই হয়। সে খাওয়াও রাজ রাজড়ার খাওয়া। সকালবেলা পাউরুটি, চিনি, একটা কলা আর এককাপ দুধ। সন্ধ্যাবেলা বইখাতা নিয়ে বসতে হয়। কালো মোটামতো একজন মহিলা অনেককে বর্ণপরিচয় শেখান। একটি ব্ল্যাক বোর্ডে প্রকাণ্ড একটা 'অ' লিখে সুরেলা স্বরে বলেন, 'বলো অ'। সবাই সমস্বরে বলে 'অ'। 'বলো আ'...।

আজরফের খুব মজা লাগে। পড়া শেষ হওয়ার পর হয় প্রার্থনা। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত করুণ সুরে টেনে টেনে বলেন,

হে পরম করুণাময় ঈশ্বর।
তুমি তোমার মঙ্গলময় করুণার হস্ত প্রসারিত করো।...

প্রার্থনার জায়গায় এলেই আজরফের ভয় ভয় করে। কে জানে এরা হয়তো 'খিরিশ্চান' করে ফেলছে। আমিন ডাক্তার অবশ্যি বলেছে ভয়ের কিছু না, খিরিশ্চানি প্রার্থনার ফাঁকে ফাঁকে কলেমা তৈয়্যেব পড়লেই দোষ কাটা যাবে। আমিন ডাক্তারের মতো জ্ঞানী লোককে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই। আজরফের আর ভয়-টয় করে না। ভয় করে মতি মিয়ার। কোনো কারণ ছাড়াই ভয় করে।

নৌকা ছেড়ে নড়তে চায় না। আমিন ডাক্তারের ঠেলাঠেলিতে শরিফাকে দেখতে গিয়ে এক কাণ্ড। হাসপাতালের বারান্দায় মুখভর্তি করে বমি করে। আমিন ডাক্তার শঙ্কিত হয়ে বলে, হইল কী তোমার মতি ভাই ?

বদ গন্ধ। মাথার মধ্যে পাক দেয়।

তোমারে নিয়া মুশকিল। ঐটা তো ফিনাইলের গন্ধ।

কিসের গন্ধ ?

ফিনাইল। এক কিসিমের সাবান। খুব ভালো জিনিস।

ভালো জিনিস মাথায় থাকুক। মতি মিয়া বাড়ি ফিরে বাঁচে, নুরুদ্দীন বাপের সঙ্গে ফিরে যেতে কোনো আপত্তি করে না। মতি মিয়া বারবার জিজ্ঞেস করে, মার লাগি মন কান্দেনি নুরু ?

নাহ।

দুই দিন পরেই দেখবি আইয়া পড়ছে।

আইচ্ছা।

খুব বেশি হইলে এক হপ্তা। এর বেশি না।

আইচ্ছা।

যাত্রা দেখতে চাস ? মোহনগঞ্জে যাত্রা আইছে। বিবেকের পাঠ করে আসলাম মিয়া। ছয়টা সোনার মেডেল। দেখবি ?

নাহ।

না বললেও মতি মিয়া একরাত মোহনগঞ্জে থেকে যায়। এত কাছে এসে আসলাম মিয়ার বিবেকের গান না-শোনা পাপের শামিল। নিত্যিদিন তো আর এমন সুযোগ হয় না। মোহনগঞ্জ বাজারে দেখা হয়ে যায় কানা নিবারণের সাথে। সেও খুবসম্ভব আসলামের গান শুনতে এসেছে। সে একটা বড় কাপড়ের দোকানের সামনে বসে ছিল। তার মুখ দিয়ে ভক ভক করে দেশী মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

ও নুরা দেখছস ? হই দেখ কানা নিবারণ।

কোন জন ?

কালামতো মোটা। লম্বা বাবরি।

চউখ তো দুইটাই আছে, ইনারে কানা নিবারণ ডাকে ক্যান ?

ছেলের কথায় মতি মিয়া বড়ই খুশি হয়। ছেলে চুপচাপ থাকলে কী হবে বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিকই আছে। মতি মিয়া হাসিমুখে বলে, মাইনষের খিয়াল। মাইনষের খিয়ালের কি ঠিক ঠিকানা আছে ? ছেলেকে দাঁড়া করিয়ে মতি মিয়া চলে যায় কানা নিবারণের সামনে।

দেখা না করে যাওয়াটা ঠিক না।

নিবারণ বাই, শইলডা বালা ?

কানা নিবারণ কথা বলে না। ভ্রু কুঁচকে তাকায়।

চিনছেন আমারে ? আমি মতি। সোহাগীর মতি মিয়া।

কানা নিরারণ ঘোলাটে চোখে তাকায়। উত্তর দেয় না।

আসলাম মিয়ার গাওনা হুনতে আইছেননি নিবারণ ভাই ?

কানা নিবারণ সে-কথার জবাব দেয় না।

বাড়ি ফিরেও নুরুদ্দীন কোনোরকম ঝামেলা করে না। নিজের মনেই থাকে। মতি মিয়া বারবার জিজ্ঞেস করে, মার লাগি পেট পুড়ে ?

নাহ।

মুখ শুকনা ক্যান ? নিশ্চয় পেট পুড়ে ?

নাহ।

মতি মিয়ার নিজেরই খারাপ লাগে। কিছুতেই মন বসে না। নইম মাঝির বাড়ি সন্ধ্যার পর গানবাজনার আয়োজন হয়। মতি মিয়া রোজ যায়, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। সেখানেও শুধুই যাই যাই করে।

সইন্ধ্যা কালে বাড়িত গিয়া করবাটা কী মতি ভাই ?

পুলাডা একলা আছে।

হে তো ঘুমাইতেছে। বও দেহি, হুক্কাডাত একটা টান দিয়া হারমুনিডা ধরো।

বাড়ি ফিরে তার ভালো লাগে না। কেমন উদাস লাগে। রাতের খাওয়া শেষ হলে এক আধ দিন রহিমার সাথে খানিক গল্পগুজব করে। রহিমা লম্বা ঘোমটা টেনে বারান্দায় বসে। কথা বলার সময় মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখে। মতি মিয়া তার গ্রাম-সম্পর্কে ভাশুর। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা সম্ভব না। রহিমার সঙ্গে কথা বলতে মতি মিয়ার খারাপ লাগে না।

নিখল সাব কেমন ডাক্তার মতি ভাই ?

জব্বর ডাক্তার।

পরিষ্কার বাংলা কথা কয় ?

তা কয়।

গেরাইম্যা কথাও কইতে পারে ?

না। বুঝতে পারে।

দুনিয়াডাত কত কিসিমের জিনিসই না আছে মতি ভাই।

কথাডা ঠিক। খুব খাডি কথা।

নিখল সাব ডাক্তাররে দেখনের বড় শখ লাগে মতি ভাই।

তা একদিন যামুনে নিয়া। দুই দিনের মামলা।

দেখতে দেখতে মাস পার হয়ে যায়, ঘোর বর্ষা নামে। শরিফাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। এক সপ্তাহের কথা বলে চৌধুরীদের একটা নৌকা নেওয়া হয়েছিল। চৌধুরীবাড়ির কামলা এসে রোজ হম্বিতম্বি করে।

বৈশাখ মাসের শেষাশেষি। কাজ কর্ম নাই। সোহাগীতে বোরো ধান ছাড়া কিছুই হয় না। ভাটি অঞ্চলগুলিতে তাই অগ্রহায়ণ না আসা পর্যন্ত অলস মন্থর দিন কাটে। মতি মিয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করে। শরিফাদের ফিরতে এতটা দেরি হওয়ার কারণ খুঁজে পায় না। বড়ই মন খারাপ লাগে তার। পাড়াপড়শিও খোঁজখবর করে।

বাচ্চা বিয়াইতে বাপের বাড়িতে গেলেও তো একমাসের মধ্যে ফিরে, কিন্তু ইদিকে যে মাসের উপর হইল। খোঁজখবর করো মতি। গাছের মতো থাইকো না।

নইম মাঝি একদিন ঠাট্টার ছলে অন্যরকম একটা ইঙ্গিত করে, মতি ভাই, আমি চিন্তা করতাছি আমিন ডাক্তারের সাথে নট খট কইরা দেশান্তরী হইল কি না। পালের নৌকা তো সাথেই আছে। হা হা হা।

গা রি রি করে মতি মিয়ার। নেহায়েত বন্ধুমানুষ বলে চুপ করে থাকে। নইম মাঝি বলে, রাগ করলা নাকি ও মতি ভাই। ঠাট্টা মজাক বুঝো না তুমি?

না, রাগ ফাগ করি নাই।

আর বিবেচনা কইরা দেখো, আমিন ডাক্তারের সাথে ভাবি সাবের খাতির প্রণয় একটু বেশিই ছিল। হা হা হা।

হাইসো না নইম, এইসব হাসি মজাকের কথা না।

এই তো রাগ হইলা। ভাবির লগে রঙ্গ-তামাশা না করলে কার লগে করমু?

হাসিঠাট্টা বুঝতে পারার মতো বুদ্ধিশুদ্ধি মতি মিয়ার আছে। কিন্তু শরিফা এবং আমিন ডাক্তারকে নিয়ে এই জাতীয় ঠাট্টা সে সহ্য করতে পারে না। কারণ ব্যাপারটা পুরোপুরি ঠাট্টা নয়। আমিন ডাক্তার কাজে অকাজে তার বাড়ি এসে গলা উঁচিয়ে ডাকবে, দোস্তাইন ও দোস্তাইন। চায়ের পাতা নিয়ে আসলাম। জবর পাতা। একটু চা খাওন দরকার। ঘরে গুড় আছে?

মতি মিয়ার অসংখ্যবার ইচ্ছা হয়েছে আমিন ডাক্তারকে ডেকে বলে দেয় যাতে সময়ে অসময়ে এইভাবে না আসে। কিন্তু কোনোদিন বলা হয় নাই। এটা অত্যন্ত ছোট কথা। আমিন ডাক্তারের মতো বন্ধুমানুষকে এমন একটা ছোট কথা বলা যায় না।

শরিফাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে মতি মিয়া অনেক কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। গানবাজনা এখন আর ভালো লাগে না। নিখল সাব ডাক্তারের হাসপাতালে চলে গেলে হয়। মেলা খরচার ব্যাপার।

আবার একটু লজ্জা লজ্জাও করে। নুরুদ্দীনকে আড়ালে একবার জিজ্ঞেস করে, ও নুরা মারে আনতে যাইবি?

নাহ।

না কী ব্যাটা? মার লাগি পেট পুড়ে না? কস কী হারামজাদা। মায়া মুহব্বত কিছুই দেহি তর মইধ্যে নাই।

নুরুদ্দীন মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে দেখে মনেই হয় না মায়ের দীর্ঘ অনুপস্থিতি তাকে কিছুমাত্র বিচলিত করেছে।

নুরুদ্দীন রহিমার মেয়ে অনুফার সাথে গম্ভীর মুখে সারা দিন খেলাধুলা করে। দুপুরের দিকে প্রায়ই দেখা যায় নুরুদ্দীন গাঙের পাড়ের একটি জলপাই গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। গাছের নিচে পা ছড়িয়ে বসে আছে অনুফা। দুইজনেই নিজের মনে বিড়বিড় করে কথা বলছে। মতি মিয়া বেশ কয়েকবার লক্ষ করেছে ব্যাপারটি। একদিন নুরুদ্দীনকে ডেকে ধমকেও দিল, গাছের মধ্যে বইয়া থাকস বিষয়ডা কী?

নুরুদ্দীন নিরুত্তর।

দুপুরবেলা সময়ডা খারাপ। জিন ভূতের সময়, হেই সময় গাছে বইয়া থাকনের দরকার কী?

নুরুদ্দীন চোখ পিটপিট করে। কথা বলে না।

খবরদার আর যাইস না।

আইচ্ছা।

তবু নুরুদ্দীন যায়। জলপাই গাছের নিচু ডালটিতে পা ঝুলিয়ে বসে আপন মনে কথা বলে। গাছের গুড়িতে বসে থাকে অনুফা। ক্ষণে ক্ষণে ফিকফিক করে হাসে। মতি মিয়া ঠিক করে ফেলে নুরুদ্দীনের জন্যে একটা তাবিজ টাবিজের ব্যবস্থা করা দরকার। লক্ষণ ভালো না। রহিমার সঙ্গেও এই বিষয়ের সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। মতি মিয়া আড়াল থেকে শুনেছে রহিমার সঙ্গে সে হড়বড় করে অনবরত কথা বলে। রাতেরবেলা কাঁথা বালিশ নিয়ে রহিমার সঙ্গে ঘুমোতে যায়। এতটা বাড়াবাড়ি মতি মিয়ার ভালো লাগে না।

রহিমা মেয়েটি অবশ্যই খুবই কাজের। এই কয়দিনেই সে বাড়ির চেহারা পাল্টে ফেলেছে। পুবের ঘরের সামনে আগাছার যে জঙ্গল ছিল তার চিহ্নও নেই। চার-পাঁচটা কাগজি লেবুর কলম লাগিয়েছে সারি করে। বাড়ির পেছনের রান্নার জায়গাটা দরমা দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। ঘাটে যাওয়ার পথটায় সুন্দর করে ইট বসানো। ইটগুলি যোগাড় হয়েছে কোত্থেকে কে জানে? মতি মিয়ার ইচ্ছা করে রহিমাকে এই বাড়িতেই রেখে দিতে। শরিফার ঘরের লাগোয়া একটা ছোটমতো চালাঘর তুলে দিলেই হয়। শরিফা কিন্তু রাজি হবে না। কেঁদেকেঁটে বাড়ি মাথায় করবে। কারণ রহিমার বয়স অল্প এবং সে সুন্দরী। একটি সুন্দরী এবং অল্পবয়েসী মেয়েকে জেনেশুনে কোনো বাড়ির বৌ নিজের বাড়িতে রাখবে না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি আমিন ডাক্তার নৌকা নিয়ে উপস্থিত। তাকে আর চেনার উপায় নেই। গায়ে বড় একটা কটকটে লাল রঙের কোট। কোটটির ঝুল নেমে এসেছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। চোখে সোনালি রঙের একটি নিকেলের চশমা। কোটটি নিখল সাব আসবার সময় দিয়েছেন। চশমাটি হাসপাতালে খুঁজে পাওয়া।

চশমায় সব জিনিস কেমন যেন ঘোলাটে দেখায়। কোটের সঙ্গে চশমা না থাকলে মানায় না বলেই গ্রামে ঢুকবার মুখে আমিন ডাক্তার চোখে চশমা দিয়ে নিয়েছে।

মতি মিয়া নইম মাঝির ঘরে তাস খেলছিল। খবর পেয়ে দৌড়ে এসেছে। এত রাতেও আশেপাশের দুএক ঘরের মেয়েছেলেরা এসে জড়ো হয়েছে। নুরুদ্দীন কাঁচা ঘুম ভেঙে অবাক হয়ে দাওয়ায় বসে আছে।

শরিফা ঘরের ভেতরে চৌকির ওপর বসেছিল। মতি মিয়াকে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন কোনো কারণে লজ্জা পাচ্ছে। মতি মিয়া অবাক হয়ে দেখল, শরিফার গোল মুখটা কেমন যেন লম্বাটে লাগছে। চুল অন্যভাবে বাঁধার জন্যেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক শরিফাকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, শরীলডা বালা ?

শরিফা জবাব দিল না।

কি, শরীলডা বালা ?

শরিফা থেমে থেমে বলল, পাওডা কাইট্টা বাদ দিছে।

মতি মিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। সত্যি সত্যি শরিফার একটা পা নেই।

শরিফা বলল, বাঁচনের আশা আছিল না। কপালে আরও দুঃখ আছে হেই কারণে বাঁচলাম। তোমার শইলডা কেমন ?

মতি মিয়া চুপ করে রইল। সে তখনো শরিফার একটি পা যা শাড়ির ফাঁক দিয়ে বের হয়ে আছে, সেদিকে তাকিয়ে আছে। সেই পা-টিতে আবার টুকটুক একটা নতুন স্যান্ডেল। শরিফা থেমে থেমে বলল, রহিমা ওখনো এই বাড়িত ক্যান ? তারে বিদায় দেও নাই ক্যান ? যুবতী মাইয়া মানুষ নিয়া এক ঘরে থাকছ কাজটা ভালো করো নাই। রহিমারে কাইল সক্কালেই বিদায় দিবা, বুঝছ ?

মতি মিয়া জবাব দিল না। শরীফা চিকন সুরে বলল, আর নুরার শইলডা কেমুন খারাপ হইছে। আমি ডাক দিছি হে আসে নাই। দৌড় দিছে রহিমার দিকে। এইসব বালা লক্ষণ না। রহিমা তার কেডা ?

৩

রহিমা তার পুঁটলি গুটিয়ে মেয়ের হাত ধরে চৌধুরীবাড়ি চলে গেল। তার নিজের বাড়িঘর কিছু নেই। চৌধুরীদের দালানের শেষ মাথায় একটি অন্ধকার কুঠুরিতে সে মাঝে মধ্যে এসে থাকে। চৌধুরীরা কিছু বলে না। যতদিন এখানে থাকে ততদিন যন্ত্রের মতো এ বাড়ির কাজকর্ম করে, যেন এটিই তার বাড়িঘর।

এক নাগাড়ে অবশ্যি বেশিদিন থাকতে হয় না। গ্রামের কোনো পোয়াতি মেয়ের বাচ্চা হয়েছে। কাজকর্মের লোক নেই। রহিমাকে খবর দেয়। রহিমা তার ছোট্ট পুঁটলি আর মেয়ের হাত ধরে সে বাড়িতে গিয়ে ওঠে। রান্নাবান্না করে। শামুক ভেঙে

হাঁসকে খাওয়ায়। ছাগল হারিয়ে গেলে হারিকেন জ্বালিয়ে খুঁজতে বের হয়। যেন নিতান্তই সে এই ঘরেরই কেউ। নতুন বাচ্চাটি একদিন শক্ত সমর্থ হয়ে ওঠে, রহিমাকে মেয়ের হাত ধরে আবার ফিরে আসতে হয় চৌধুরীবাড়ির অন্ধকার কোঠায়। প্রথম প্রথম খারাপ লাগত, এখন আর লাগে না।

দীর্ঘদিন পর আজ এই প্রথম রহিমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মতি মিয়ার ঘরবাড়ি কোনো এক বিচিত্র কারণে তার কাছে আপন মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল এখানে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে চমৎকার হতো। তার কপালটা এরকম কেন ?

নতুন বউ হয়ে যখন আসে, অনুফার বাবা তখন কামলা মানুষ। বউ তোলার জায়গা নেই।

মানুষটা নতুন বৌকে চৌধুরীদের বারান্দায় বসিয়ে রেখে উধাও হয়ে গেছে ঘর দুয়ারের ব্যবস্থা করতে। চৌধুরী সাহেব মহা বিরক্ত, নতুন বৌয়ের সামনেই ধমকাচ্ছেন, অগ্রহায়ণ মাসে এমন কাম কাজের সময় কেউ কি বিয়া শাদি করে ? তোর মতো আহম্মক খোদার আলমে নাই রে মনু।

লোকটা দাঁত বের করে হাসে। চৌধুরী সাহেব প্রচণ্ড ধমক দেন, হারামজাদা হাসিস না! আমার পুবের একটা ঘর খালি আছে, বৌরে সেইখানে নিয়া তোল।

চদুরী সাব, নিজের একটা ঘরে নিয়া তুলনের ইচ্ছা। বাঁশ টাশ যদি দেন তো একটা ঘর বানাই।

চৌধুরী সাহেব চোখ কপালে তুলে বললেন, ঘর তুলবি জায়গা জমি কই ? ঘর তুলবি কিসের উপর ?

আমার বসতবাড়ির লাগি একটুখানি জায়গাও যদি দেন। ধীরে ধীরে দাম শোধ করবাম।

বলতে বলতে লোকটা হাসে। যেন খুব একটা মজার কথা বলছে। চৌধুরী সাহেব অবশ্যি তাকে জায়গা দেন। মসজিদের কাছের এক টুকরো পতিত জমি। লোকটা ঘরামির কাজে খুব ওস্তাদ ছিল। দেখতে দেখতে বাঁশ কেটে চমৎকার একটা ঘর তুলে ফেলল। নতুন কাটা কাঁচা বাঁশের গন্ধে রহিমার রাতে ঘুম আসে না। পেটের মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে। লোকটির অবশ্যি ফূর্তির সীমা নেই। দুপুররাতে কুপি জ্বালিয়ে বাঁশের কঞ্চি কাটছে। ঘরের চারদিকে বেড়া দেবে। বিশ্রাম কী জিনিস সে জানত না।

কিন্তু সেই বৎসর খুব কাজে ফাঁকি দিল। চৌধুরীদের তখন জালা বোনা হচ্ছে। দম ফেলার সময় নেই। কাজে বিরাম দিয়ে এক দণ্ড যে হুকা টেনে শরীর গরম করবে সে অবসরটাও নেই। এর মধ্যেই দেখা গেল মনু উধাও। অন্য মনিব হলে কী হতো বলা যায় না, চৌধুরী সাহেব বলেই দেখেও দেখেন না। পুরুষমানুষ দিনেদুপুরে বাড়ি

এসে বৌয়ের সঙ্গে গল্প—কী লজ্জার কথা। রহিমা শরমে মরে যায়। কিন্তু লোকটার লাজ লজ্জার বালাই নেই। একরাত্রে রহিমাকে জোর করে নৌকায় তুলে বড় গাঙ পর্যন্ত চলে গেল। চাঁদনি রাতে নৌকা বাওয়ার মধ্যে খুব নাকি আনন্দ। আনন্দ ছিল ঠিকই। নদীর জলে ভেঙে পড়া জ্যোৎস্না, দূরের বিল থেকে ভেসে আসা হঅ হঅ শব্দ, দুই পাশে গাছগাছালির গায়ে মাখা অদ্ভুত এক জ্যোৎস্না ভেজা অন্ধকার। কী যে ভালো লেগেছিল রহিমার। এর মধ্যে ঐ লোক আবার ভাঙা গলায় গান ধরল। সুর-তাল কিছুই নেই, তবু সেই গান শুনে বারবার চোখ ভিজে উঠল রহিমার।

মানুষটি বড় শৌখিনদার ছিল। দুটাকা দিয়ে একবার এক গায়েমাখা সাবান কিনে আনল। কী বোটকা গন্ধ, গা বমি বমি করে। আরেকবার কিনল হাঁটু পর্যন্ত উঁচু রবারের জুতো। এই পাঁক-কাদার দেশে কেউ জুতো কিনে ? সরকারবাড়ির নেজাম সরকার পর্যন্ত খালি পায়ে মাঠে যান ক্ষেত দেখতে। জুতো কেনার পর থেকে মচমচ শব্দে লোকটা শুধু হাঁটে। চৌধুরী সাহেব একদিন ডেকে বললেন, টেকাপয়সা জমাইবার অভ্যাসটা কর মনু। নিজের একটা বাড়িঘর কর। বিয়াশাদি করছস দায় দায়িত্ব আছে। খামাখা এই জুতাডা কিনলি ক্যান ?

জুতাডা চদুরী সাব হস্তায় পাইছি। খুব কামের। পানির মইধ্যে হারাদিন থাকলেও এক ফোঁডা পানি ডুকত না।

এইসব ধান্ধা বাদ দে মনু।

লোকটার স্বভাব তবু বদলায় না। ভাদ্র মাসে ছাতি কিনে ফেলল একটা। বাহারি ছাতি। বাঁটের মধ্যে হরিণের মুখ। বড়ই রাগ হয় রহিমার। কিন্তু কার ওপর রাগ করবে ? এই লোক কি রাগ টাগ কিছু বুঝে ? চৌধুরী সাহেব খুব বিরক্ত হন।

বৃষ্টিবাদলা কিছু নাই। শুকনা দিন। মাথার মইধ্যে ছাতি কেন রে মনু ?

নয়া কিনছি চদুরী সাব। পাইকারি দরে দিছে।

তোর কপালে দুঃখ আছে মনু।

হা হা করে হাসে মনু। যেন ভারি একটা মজার কথা শুনল।

সেই লোক কোথায় যে হারিয়ে গেল।

গয়নার নৌকায় মোহনগঞ্জ গিয়েছে পরদিন ফেরার কথা। আর ফিরে নাই। দেখতে দেখতে মাস শেষ হলো। কোনো খোঁজই নেই। কী কষ্ট কী কষ্ট! অনুফা তখন পেটে। রাতের পর রাত জেগে বসে থাকে রহিমা। খুট শব্দ হলেই লাফ দিয়ে উঠে, এল বুঝি। কত রকম উড়ো খবর আসে। একবার শুনল, বাজারের একটা মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাকে। সেই মেয়ে মানুষটা চোখে সুরমা দেয় ঘাগড়া পরে। আবার একবার শুনল আসাম গেছে। আসামে কাঠের ব্যবসা করে।

হয়তো তাই একদিন টাকাপয়সা নিয়ে গভীর রাতে রবারের জুতোয় মচমচ শব্দ করে লোকটা উপস্থিত হবে। রহিমা যত রাগই করুক লোকটা গলা ফাটিয়ে হাসবে হা হা হা।

বৈশাখ মাসে অনুফার জন্ম হলো। চৌধুরী সাহেব বললেন, বাচ্চা নিয়ে তাঁর বাড়িতে এসে থাকতে। রহিমা রাজি নয়। হঠাৎ যদি কোনোদিন লোকটা এসে উপস্থিত হয় তখন ?

গায়ের সবাই সাহায্য করেছে। চালডাল তরিতরকারি—অভাব কিছুরই হয়নি। চৌধুরী সাহেব মেয়ের মুখ দেখে ২০টি টাকা দিলেন। আমিন ডাক্তারের মতো হতদরিদ্র লোকও পাঁচটি টাকা দিয়ে গেল।

অনুফা একটু বড় হতেই অন্যরকম ঝামেলা শুরু হলো। গভীর রাত্রে ঘরের পাশে কে যেন হাঁটাহাঁটি করে। খুট খুট করে দরজায় শব্দ। ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে রহিমা।

কেডা গো, কেডা ?

আর কোনো সাড়া নেই। শেষ পর্যন্ত যেতে হলো সুরুজ মিয়ার বাড়ি। চৌধুরী সাহেবের ওখানে যেতে সাহসে কুলোয় না। ছোট চৌধুরী পাগল মানুষ। কোনো কোনো সময় দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে রাখতে হয়।

সুরুজ মিয়ার স্ত্রীটি চিররুগ্ন। তার দুবছরের ছেলেটিও সেরকম । রাতদিন ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে। রহিমার নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত রইল না। ধান কাটার সময় তখন। সুরুজ মিয়া অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ। তিন-চারজন উজান দেশী জিরাতি কামলা তার। সকাল থেকে দুপুররাত পর্যন্ত খাটা খাটনি করতে হয় রহিমাকে। খারাপ লাগে না। কিন্তু এক গভীর রাত্রে সুরুজ মিয়া এসে তার ঘরে ঢুকে পড়ল। স্তম্ভিত রহিমা কিছু বুঝবার আগেই সুরুজ মিয়া তার মুখ চেপে ধরল, শব্দ কইরো না, মাইয়া জাগব!

মেয়ে অবশ্যি জাগল না। একসময় অন্ধকার ঘরে বিড়ি ধরাল সুরুজ মিয়া। ফিসফিস করে বলল, পাপ যা হওনের হেতো আমার হইল, তুমি কান্দ ক্যান ? শরীরের মইধ্যে কোনো দোষ লাগে না। বুঝছ ?

রহিমা চলে এল চৌধুরীবাড়ির অন্ধকার কোঠায়। ছোট চৌধুরী লাল চোখে ঘুরে বেড়ায়। রহিমার আর ভয় লাগে না। অনুফাকে মাঝে মাঝে তাড়াও করে। অনুফা খেলা মনে করে খিলখিল করে হাসে। ছোট চৌধুরী চোখ বড় বড় করে বলে, হাসিস না হারামজাদি বিচ্ছু। খবরদার হাসিস না।

একসময় সেই লোকটির চেহারাও রহিমার মনে রইল না। মাঝে মাঝে খুব যখন ঝড়বৃষ্টি হয়, বিলের দিক থেকে শাঁ শাঁ শব্দ ওঠে, তখন ভাবতে ভালো লাগে লোকটা রবারের জুতো পায়ে দিয়ে মচমচ করে যেন এসেছে। অসম্ভব তো কিছুই নয়। হারিয়ে যাওয়া মানুষ তো কতই ফিরে আসে।

কিংবা কে জানে সেই লোকটি হয়তো কোনো এক ভিন দেশে গিয়ে আমিন ডাক্তারের মতো মহাসুখে আছে। আমিন ডাক্তার যেমন একদিন গয়নার নৌকায় করে সোহাগীতে উপস্থিত হলো তারপর আর যাওয়ার নাম করল না। কে জানে সেও

উজান দেশে তার বৌ মেয়ে ফেলে এসেছে কি না। হয়তো তারাও অপেক্ষা করে আছে কবে ফিরবে আমিন ডাক্তার। রহিমার বড় জানতে ইচ্ছে করে।

৪

শরিফার কিছুই ভালো লাগে না।

এটি যেন তার নিজের বাড়ি নয়। যেন সে বেড়াতে এসেছে। পাড়া প্রতিবেশী বৌঝিরাও কেমন যেন সমীহ করে কথা বলে। একটু দূরত্ব রেখে বসে। নানান কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে, কাটা পাওডা কই ফালাইয়া আসছ?

শরিফার অসহ্য বোধ হয়। সরু গলায় বলে, হাসপাতালেই রাইখ্যা আইলাম। সাথে আইনা কী করবাম?

নইমের বৌ ভীত স্বরে বলে, পাওডারে কবর দিছে?

শরিফার কাঁদতে ইচ্ছা করে। এক পা নিয়ে কাজকর্ম সে কিছুই করতে পারে না। সারা সকাল লেগে যায়, ভাত ফুটাতে। থালাবাসন ধোবার জন্যে আজরফকে কলসি দিয়ে পানি এনে দিতে হয়। হাসপাতালে থাকার সময় এইসব ঝামেলার কথা তার মনে হয়নি। আমিন ডাক্তার সব দেখেশুনে গম্ভীর হয়ে বলল, রহিমারে খবর দিয়া আনা দরকার দোস্তাইন।

না।

কিছুদিন সে থাকুক।

কইলাম তো—না।

সুবিধার লাগিন কইতাছি।

আমার সুবিধা দেখনের দরকার নাই।

শরিফা কাঁদতে শুরু করল। তার একটি নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে। প্রায়ই যে-কোনো প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করে শেষ পর্যায়ে কাঁদতে শুরু করবে।

দোস্তাইন কান্দনের কারণ তো কিছু নাই।

যার আছে হে বুঝে।

ইদানীং শরিফার মনে ধারণা হয়েছে মতি মিয়া তাকে এখন আর দেখতে পারে না। গত রাত্রে মতি মিয়া বারান্দায় বসেছিল। শরিফা তিনবার গিয়ে ডাকল। তিনবারই সে বিরক্ত হয়ে বলল, ঘুমাইবার সময় হউক—সইন্ধ্যা রাইতেই ডাক ক্যান? আমি তো আর নয়া শাদি করি নাই—সইন্ধ্যা রাইতেই ঘরে খিল দেওনের যোগাড় করবাম।

কী কথার কী জবাব। শুধু মতি মিয়া? আজরফ পর্যন্ত তার কথার জবাব দেয় না। এক কথা দশবার জিজ্ঞেস করতে হয়।

একদিন দেখা গেল আজরফ বাঁশ আর চাটাই দিয়ে ঘরের লাগোয়া নতুন একটা চালা ঘর তুলছে। নুরুদ্দীন মহা উৎসাহে এটা ওটা আগিয়ে দিচ্ছে। মতি মিয়া হুকা হাতে দাওয়ায় বসে তদারক করছে। ঘরে নতুন কাজকর্ম হলে আজকাল আর কেউ শরিফাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। শরিফা মুখ কালো করে বলল, আজরফ ঘর তুলতাছস ক্যান ?

আজরফ জবাব দিল না। যেন শুনতেই পায়নি।

আজরফ, নয়া ঘর তুলনের দরকারডা কী ?

জবাব দিল মতি মিয়া, পুলাপান বড় হইতাছে একটা ঘর তো দরকার।

শরিফা লক্ষ করল নুরুদ্দীন মুখ টিপে হাসছে।

বিষয়টা কী নুরা ?

নুরুদ্দীন দাঁত বের করে হাসল।

ঘর উঠতাছে রহিমা খালার লাগি। রহিমা খালা আর অনুফা থাকবে।

শরিফা স্তম্ভিত হয়ে গেল। মতি মিয়া থেমে থেমে বলল, তোমার সুবিধা হইব খুব। ঘরের কাজকাম দেখব।

আমি বাইচ্চা থাকতে এই বাড়িতে কেউ আসত না।

মতি মিয়া বলল, আইজ সইন্ধ্যায় আইব। খামাখা চিল্লাইও না।

আমি গলাত দড়ি দিয়াম কইতাছি।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে ডাকল, আজরফ।

জি।

তোর মারে বালা দেইখ্যা একটা দড়ি দে দেহি।

রহিমা সত্যি সত্যি সন্ধ্যা নাগাদ এসে পড়ল।

সে তার যাবতীয় সম্পত্তিও সঙ্গে এনেছে। একটি টিনের ট্রাঙ্ক, ছয়-সাতটি ছোটবড় পুঁটলি, হাঁড়ি, ডেকচি। অনুফার হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ছাগল। রহিমা শরিফার ঘরে ঢুকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, বুজির শইলডা বালা ?

শরিফা কোনো কথা বলল না। রাতে খাওয়ার সময় বলে পাঠাল তার খিদে নেই। অনেক রাত্রে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। শরিফা শুনল নতুন চালাঘরে খুব হাসাহাসি হচ্ছে। মতি মিয়া কী একটা বলছে, সবাই হাসছে। সবচেয়ে উঁচু গলা হচ্ছে নুরুদ্দীনের।

অনেক রাত্রে মতি মিয়া যখন ঘুমাতে এল শরিফা তখনো জেগে। কুপি নিবিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে শরিফা ক্ষীণস্বরে বলল, একটা কথার সত্যি জবাব দিবা ?

কী কথা ?

তুমি কি রহিমারে বিয়া করতে চাও ?

মতি মিয়া দীর্ঘসময় চুপচাপ থেকে বলল, হ।

তুমি রহিমারে এই কথা কইছ ?

না, আমিন ডাক্তার কইছে রহিমার মত নাই। তার ধারণা মনু বাইচ্চা আছে।

মতি মিয়া হুকা ধরাল। শরিফা ধরা গলায় বলল, বিয়াডা কবে ?

মত না থাকলে বিয়াডা হইব কেমনে ?

আইজ মত নাই একদিন হইব।

মতি মিয়া নির্বিকার ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডাকতে লাগল। শরিফা সারা রাত জেগে বসে রইল।

৫

গোটা জ্যৈষ্ঠ মাসে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি।

বৃষ্টিবাদলা না হলে জ্বরজারি হয় না। রোগী পত্র নেই, আমিন ডাক্তার মহাবিপদে পড়ে গেল। হাত একেবারে খালি। চৌধুরীবাড়িতে ত্রিশ টাকা কর্জ হয়েছে। গত বিশদিনে রোগী এসেছে মাত্র একটি। সুখান পুকুরের আছিমুদ্দীনের মেজ ছেলে। ভিজিটের টাকা দূরে থাক ওষুধের দামটা পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অছিমুদ্দিন নিমতলীর পীর সাহেবের নামে কিরা কেটেছে হাটবার দিন সকালবেলা এসে দিয়ে যাবে। নিমতলীর পীর জ্যান্ত পীর। তার নাম নিয়ে টালবাহানা করা যায় না। কিন্তু অছিমুদ্দীন লোকটি মহাধুরন্ধর। আজ নিয়ে তিন হাট গেল তার দেখা নেই।

আমিন ডাক্তার শুকনো মুখে সারা হাট খুঁজে বেড়ায়। হাটের দিন চাষা-ভুষার মতো থাকা যায় না। দশ গ্রামের লোকজন আসে। নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। কাজেই হাটবারগুলিতে আমিন ডাক্তার একটু বিশেষ সাজসজ্জা করে। আজকে দেখা গেল আমিন ডাক্তারের গায়ে এই গরমেও একটি লাল কোট। হাতে ডাক্তারি ব্যাগটা কায়দা করে ধরা। ব্যাগটিতে ইংরেজিতে লেখা—

ডাক্তার এ রহমান

প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার

আমিন ডাক্তারের চোখে নিকেলের চশমা। লোকজন ঠাহর হয় না। বারবার দেখতে হয়। অছিমুদ্দীনের মেছো হাটায় থাকার কথা। সেখানে পাওয়া গেল সিরাজুল ইসলামকে। সিরাজুল ইসলাম নিমতলীর ডাক্তার। সমগ্র ভাটি অঞ্চলে তার নামি ডাক্তার হিসেবে খ্যাতি। লোকটি ছোটখাটো, টেনে টেনে অত্যন্ত কায়দা করে কথা বলে। সিরাজুল ইসলাম আমিন ডাক্তারকে দেখামাত্র একগাল হেসে বলল, এই গরমের মধ্যে এমন কোট ? সর্দি গর্মি হয়ে মরবেন, বুঝলেন ?

আমিন ডাক্তার হাটের দিনগুলিতে যথা সম্ভব শহুরে কথা বলতে চেষ্টা করে। চারদিকে লোকজন আছে। ডাক্তার শহুরে কথা বললে এরা খুব সমীহ করে।

শরীরটা খারাপ জ্বর জ্বর ভাব—ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে এই জন্যেই গরম কাপড় পরলাম।

চশমা নতুন নিলেন নাকি ?

হুঁ।

সিরাজুল ইসলাম খিলখিল করে হাসতে লাগল। এর মধ্যে হাসির কী আছে আমিন ডাক্তার বুঝতে পারল না।

হাসেন কেন ?

হাসি এলে হাসব না ? বলছেন ইনফ্লুয়েঞ্জা। এই সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে কীভাবে ? আরে এখনো ইনফ্লুয়েঞ্জাই চিনলেন না ডাক্তারি করেন কীভাবে ? হা হা হা। যেমন দেশ তেমন ডাক্তার।

সিরাজুল ইসলামের হাসির শব্দে লোক জমে গেল। আমিন ডাক্তার চট করে সরে পড়ল। মেছো হাটায় অছিমুদ্দীকে পাওয়া গেল না। অথচ তার এখানেই থাকার কথা। কারণ ছাড়া এক জায়গায় ঘোরাঘুরি করা যায় না। আমিন ডাক্তার এক প্রকাণ্ড রুই মাছ দাম করে ফেলল। গম্ভীর গলায় বলল, মাছ কত রে ?

মাছ বিক্রি করছিল নিমতলীর জলিল। সে দাম না বলে মাছ গেঁথে ফেলল।

আপনের সাথে দর দাম কী ডাক্তার সাব ? যা হয় দিবেন।

আরে ইয়ে এত বড় মাছ। দাম টাম বল শুনি।

হুনাহুনির কিছু নাই। বড় গাঙের মাছ, এর সুআদই আলাদা।

আমিন ডাক্তার পড়ে গেল মহাবিপদে। বহু কষ্টে মুখের হাসি বজায় রেখে বলল, মুছিবত হয়ে গেল দেখি। টাকা তো আনতে মনে নেই। কী যেন বলে ভুলে বোধহয় বাড়িতে ফালাইয়া আসছি।

মুছিবত কিছু না ডাক্তার সাব, টেকা আপনে পরের হাটে দিয়েন।

আমিন ডাক্তার মাছ হাতে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে রইল। একবার মনে হলো অছিমুদ্দীনের মতো দেখতে কে যেন হুট করে তরকারি হাটার দিকে চলে গেল। এত প্রকাণ্ড একটা মাছ হাতে নিয়ে অছিমুদ্দিনকে খুঁজে বের করার আর উৎসাহ রইল না। মাছ কেনাটা অবশ্য পুরোপুরি বৃথা গেল না। সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় দেখা হয়ে গেল।

মাছটা কিনলেন নাকি ডাক্তার সাব ?

তা কিনলাম।

হুঁ, রোজগার পাতি ভালোই মনে হয় ?

আমিন ডাক্তার যথাসাধ্য গম্ভীর হয়ে বলল, পাই কিছু। না পাইলে কি আর ভাটি অঞ্চলে পইড়া থাকি ?

সিরাজুল ইসলাম শুকনো মুখে চুপ করে যায়। আমিন ডাক্তার হৃষ্টচিত্তে সারা হাটে দুটি চক্কর দেয়। হাতে যে একটা পয়সা নেই, চৌধুরীদের কাছে ত্রিশ টাকা কর্জ সেইসব আর মনে থাকে না। মুখের উপর অতিরিক্ত একটা গাম্ভীর্য টেনে আনে। পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলে গম্ভীর হয়ে বলে, কি ভালো ?

কেডা, ডাক্তার সাব না ?

হুঁ। ছিলাম না অনেক দিন। নিখল সাব ডাক্তারের কাছে ছিলাম। নতুন চিকিৎসাপাতি শিখলাম। সাহেব খুব স্নেহ করতেন আমাকে। ডাক্তার ডাক্তারের মর্যাদা বুঝে তো। অশিক্ষিত মূর্খ তো নয়। কী বলো ?

গো হাটার কাছে দেখা হলো মতি মিয়ার সঙ্গে। মতি মিয়ার কেমন যেন দিশাহারা ভাব। এতবড় একটা মাছ আমিন ডাক্তারের হাতে তা মতি মিয়ার চোখেই পড়ল না।

ডাক্তার, তোমার সাথে একটা জরুরি আলাপ আছে।

আমিন ডাক্তার ভ্রু কুঞ্চিত করে বলল, তোমার কাছে সাড়ে পাঁচ টাকা পাই মতি। টাকার আমার বিশেষ দরকার।

তোমারে কখন থাইক্যা খুঁজতাছি। আছিলা কই ?

বুঝলা মতি অসুদের জন্যে তিন টাকা আর তোমার...

কথা শেষ হওয়ার আগেই মতি মিয়া আমিন ডাক্তারকে টেনে একপাশে নিয়ে আসে। গলার স্বর দুইধাপ নিচে নেমে যায়। বিষয়টি সত্যি জরুরি। 'রূপকুমারী' যাত্রাপার্টির অধিকারী খবর পাঠিয়েছে মতি মিয়া যদি বিবেকের পাঠ করতে চায় তাহলে যেন অতি অবশ্যি মোহনগঞ্জ চলে আসে। আগের বিবেক চাকরি ছেড়ে চলে গেছে বলেই এই সুযোগ।

বুঝলা ডাক্তার, বিবেকের পাঠে মোট দশ খান গান।

আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে বলল, আমারে কী জন্যে দরকার সেটাই তো মতি ভাই বুঝলাম না।

শরিফারে একটু বুঝাইয়া কইবা। তোমারে খুব মানে।

তুমি নিজেই কও।

আমি কই ক্যামনে ? আমার সাথে তো কথাই কয় না।

আবার হইল কী ?

মতি মিয়া ইতস্তত করে বলল, রহিমারে বিয়া করবাম হেইডা শোনার পরে ঝামেলা।

আমিন ডাক্তার আকাশ থেকে পড়ল।

রহিমারে শাদি করবা ? এই কথা তো আগে কও নাই।

মজাক কইরা কইছি। হাসি তামাশার কথা।

তুমি লোকটা অদ্ভুত মতি ভাই।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, অদ্ভুতের কী দেখলা ? অন্যায়টা কী কইছি ? আমার বাড়িত সারা জীবনের লাগি থাকব। বউ হইয়া থাকনটা বালা না ?

আমিন ডাক্তার চুপ করে রইল। মতি মিয়া ইতস্তত করে বলল, রহিমা রাজি আছে কি না হেইডাও তুমি একটু জাইন্যা দিবা, বুঝছ ?

কীসব কথা যে তুমি কও মতি ভাই।

মতি মিয়া ভ্রু কুঁচকে বলল, আইজ রাইতেই আইবা, ঠিক তো ?

দেখি।

দেখাদেখির কিছুই নাই আইবা আইজ।

আইচ্ছা।

মাছটা কিনলা নাকি ডাক্তার ? বিষয় কী ?

বিষয় কিছু না মাছটা লইয়া যাও। দোস্তাইনরে কইও রাইত তোমরার সাথে ভাত খাইয়াম।

অতবড় মাছ কিনলা তোমার হুনছি টেকাপয়সা কিছুই নাই।

আমিন ডাক্তার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আগামী হাটবারে টাকার কী হবে কে জানে ?

বাড়ি ফিরতে দেরি হলো। মতি মিয়া জোর করে একটা চায়ের দোকানে নিয়ে গেল। একআনা করে কাপ। সেই সঙ্গে দুই পয়সা করে একটা টোস্ট বিস্কুট।

দোকানের চায়ের সুআদই আলাদা, কী কও ডাক্তার ?

হুঁ।

আরেক কাপ খাইবা ?

নাহ।

আরে খাও। এই আরও দুইটা দে।

চায়ে চুমুক দিয়ে মতি মিয়া অস্বাভাবিক নিচুস্বরে বলল, বাজারে তিনটা মাইয়া আইছে দেখছ ? হাটবার দেইখ্যা আইছে রঙতামাশা করতাছে।

আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে তাকাল।

মতি মিয়া বলল, বাজারের মেয়ে মানুষ ছাড়া কি হাট জমে কও দেহি ? এর মইধ্যে একটার নাম ফুলন। কাঁচা হলদির লাহান গায়ের চামড়া। আর চুল কী!

তুমি এত কিছু জানলা ক্যামনে ?

আহ, দেখলাম। দূর থাইক্যা দেখলাম। তুমি কি ভাবছ গেছিলাম ? মাবুদে এলাহি।

চা গলায় লেগে মতি মিয়া বিষম খেল।

মেয়ে তিনটি নৌকা নিয়ে এসেছে। সেজেগুজে নৌকার সামনে বসে আছে দুজন। আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে দেখল একটি মেয়ে সত্যি অপূর্ব। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দেবী প্রতিমার মতো লাগছে। মতি মিয়া আমিন ডাক্তারের হাতে একটি মৃদু চাপ দিয়ে বলল, চউখ ট্যারা হইয়া যায়, কী কও ডাক্তার ? ফুলনের আরেকটা নাম হইল গিয়া তোমার পরীবানু।

তুমি জানলা ক্যামনে ?

হুনছি। হুনা কথা।

উত্তর বন্দে নেমে মতি মিয়া গুনগুন করে গান ধরল,

ও কইন্যা সোনার কইন্যা রে
ও কইন্যা রূপের কইন্যা রে

মতি মিয়ার গলা ভালো, আমিন ডাক্তারের মনটা উদাস হয়ে গেল।

৬

কাল সারা রাত শরিফার ঘুম হয়নি।

ইদানীং প্রায়ই এ রকম হচ্ছে। সারা রাত এপাশ-ওপাশ করে কাটে। পাশেই মতি মিয়া গাছের মতো ঘুমায়। শরিফার অসহ্য বোধ হয়। কাল রাতে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত গায়ে ধাক্কা দিয়ে মতি মিয়ার ঘুম ভাঙাল। মতি মিয়া ঘুম জড়ানো স্বরে বলল, কী হইছে ?

বাংলাঘরে কী যেন শব্দ করে। মনে লয় চোর আইছে।

আছে কী আমার, চোর আইব, ঘুমাও।

দেইখ্যা আও না।

মতি মিয়া ঘুরে এল, কোথাও কিছু নেই, খাঁখাঁ করছে চারদিক। মতি মিয়া ফিরে এসেই ঘুমিয়ে পড়ল। আবার তাকে শরিফা ডেকে তুলল, আমার পিছন বাড়িত যাওন লাগব।

যাওন লাগব—যাও।

একলা যাই ক্যামনে ?

দুত্তেরি মাগি। ঘুমাইতে যাওনের আগে সব শেষ কইরা যাইতে পারস না ?

থাউক যাওন লাগত না।

মতি মিয়া আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শরিফা খুন খুন করে কাঁদতে শুরু করল। লোকটা এই রকম কেন ? এমন ভাব করছে যেন শরিফা একটা কাঠের পুতলি। ছেলেগুলিও দূরে সরে যাচ্ছে। নুরুদ্দীন তো তাকে সহ্যই করতে পারে না। রাতদিন রহিমার পিছে পিছে ঘুরঘুর করে। একদিন সে গোসা করেছে ভাত খায় না। কত

সাধাসাধি। মতি মিয়া বলল, আজরফ বলল, এমনকি আমিন ডাক্তার পর্যন্ত সাধ্য সাধনা করল—খাবেই না। শেষটায় রহিমা গিয়ে বলল, বাপধন আও, খালার পাতে চাইরডা খাও।

অমনি সুর সুর করে খেতে বসল। যেন কিছুই হয়নি।

এইসব কথা মনে এলে চোখে পানি আসে। শরিফা ফুঁপিয়ে উঠল।

এই কান্দ ক্যান ?

কান্দি না।

ফুস ফুস করতাছ ক্যান ?

শরিফা ধরা গলায় বলল, আমি বাপের বাড়িত গিয়া কয়েকটা দিন থাকতাম চাই।

বাপের বাড়িত আছে কেডা ?

ভাই আছে।

ভাই ?

গলা ফাটিয়ে মতি মিয়া হাসল, এইসব চিন্তা ছাড়ান দেও। অত যে ঝামেলা গেছে তোমার গুণের ভাই একটা খোঁজ নিছে ? কও নিছে খোঁজ ?

শরিফা মিন মিন করে কী বলল ঠিক বোঝা গেল না।

চিল্লাচিল্লি বন্ধ কইরা কাজ কাম করো।

আমি চিল্লাচিল্লি করি ?

না, তুমি তো নয়া কইন্যা। মুখের মধ্যে একটা কথাও নাই।

শরিফা আজকাল অবশ্যি খুবই চেঁচামেচি করে। রহিমার সঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে ঝগড়া করে। এইডা কী রানছ ও রহিমা। ওয়াক থু। হলুদের গন্ধে মুখে দেওয়া যায় না। হলুদ সস্তা হইছে ? বাপের বাড়ির হলুদ পাইছস ? ঝাঁটা দিয়া পিডাইয়া এইসব আপদ দূর করা লাগে।

সামান্য জিনিস থেকে কুরুক্ষেত্র ঘটে যায়। শুধু তাই নয়, সুযোগ পেলেই রহিমার মেয়েটাকে সে মারধোরও করে। মেয়েটাও মার মতো চুপচাপ। মার খেয়েও শব্দ করে না। একা একা পুকুরপাড়ে বসে থাকে। শরিফার অসহ্য বোধ হয়। কাউকেই সহ্য করতে পারে না। আমিন ডাক্তারের সঙ্গেও ঝগড়া করে। ঝগড়া করে ক্লান্ত হয়ে একসময় সে কাঁদতে শুরু করে। আমিন ডাক্তার বিব্রত হয়ে বলে, কান্দনের কী হইল ও দোস্তাইন ?

আমারে বিষ আইন্যা দিয়েন।

কী ধরনের কথা কন না! না দোস্তাইন, বাজে চিন্তা বাদ দেওন দরকার।

ধানকাটা শুরু হওয়ার আগে মতি মিয়া মোহনগঞ্জে চলে যাবে। রূপকুমারী যাত্রা পার্টির অধিকারী লোক পাঠিয়েছে। শরিফা আকাশ থেকে পড়ল, ওখন তুমি যাইবা ক্যামনে, ধান কাটব কেডা ?

আজরফ কাটব।

কও কী তুমি ? আজরফ দুধের পুলা।

চুপ কর, খালি চিল্লায়।

মতি মিয়া গম্ভীর মুখে কাপড় গোছায়। শরিফা নুরুদ্দীনকে পাঠায় আমিন ডাক্তারকে ধরে আনতে। আমিন ডাক্তার আসতে পারে না। দীর্ঘদিন পর তাকে নেওয়ার জন্যে সুখান পুকুর থেকে নৌকা এসেছে। রোগী মরণাপন্ন। এখনই রওনা হওয়া প্রয়োজন।

নুরুদ্দীন তর বাপরে ধইরা বাইন্ধা রাখ, আমি আইতাছি রাইতে, বুঝছস ?

বুঝছি।

লোকটার মাথাডা খারাপ—এই সময় কেউ যায় ? নৌকা ছাড়গো তোমরা।

নৌকা ছেড়ে দেওয়ার সময় আমিন ডাক্তার আরেকবার গম্ভীর হয়ে বলে, দুই টেকা ভিজিট, ওষুধ ভিন্ন। আর নৌকা দিয়া ফিরত দিয়া যাইবা।

সুখান পুকুর পৌঁছতে পৌঁছতে রাত পুইয়ে যায়। নৌকা থেকে নেমে মাইল পাঁচেক হাঁটতে হয়। অসম্ভব কাদা এই অঞ্চলে। বড়ই কষ্ট হয় হাঁটতে। কোথাও থেমে যে বিশ্রাম নেওয়া হবে সে উপায় নেই। রোগীর বাবা ঝড়ের মতো ছুটছে, বারবার বলছে, পা চালাইয়া হাঁটেন ডাক্তার সাব।

বাড়ির সামনে মুখ লম্বা করে সিরাজুল ইসলাম বসে ছিলেন। আমিন ডাক্তারকে দেখে গম্ভীর মুখে বললেন, আপনাকেও এনেছে দেখি। হুঁ, আর কাকে আনবে ?

রোগীর বাবা পা ধোয়ার পানি আনতে গেছে এই ফাঁকে সিরাজুল ইসলাম গলা নিচু করে বললেন, ডাক্তার পিষে খাওয়ালেও কিছু হবে না। শেষ অবস্থা। আর এমন চামার বুঝলেন। দু'টাকা দেওয়ার কথা দিয়েছে এক টাকা। মাছের বাজার আর কী ?

রোগী দেখে আমিন ডাক্তার স্তম্ভিত। নয়-দশ বছরের একটা ছেলে। সমস্ত শরীর লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। চোখ ঘোর রক্তবর্ণ। শরীরে কোনো ব্যথা বোধ নেই। মাঝে মাঝে মাথা তুলে বলছে, পেটের মইধ্যে পাক খায়।

আমিন ডাক্তার এক চামচ অ্যালকালি মিকচার খাইয়ে শুকনো মুখে বলল, অবস্থা খুবই খারাপ। রোগামতো একটা মেয়ে ছেলেটির হাত ধরে বসেছিল, সে কাঁদতে শুরু করল। আমিন ডাক্তার বলল, নৌকার যোগাড় দেখেন হাসপাতালে নেওন লাগব। দিরং করণ যাইত না।

ডাক্তারদের জন্যে পান তামাক দেওয়া হয়েছে বাহির বাটিতে। সিরাজুল ইসলাম কিছুই স্পর্শ করবেন না। তিনি এক ফাঁকে আমিন ডাক্তারকে বললেন, হাসপাতালে

নেওয়ার চিন্তা বাদ দেন। এই রোগী ঘণ্টা পাঁচেকের বেশি থাকবে না। টাকাপয়সা যা দেয় নিয়ে সরে পড়েন। রোগী মরলে পয়সাও পাবেন না। আপনাকে কেউ দিয়েও আসবে না। ছোটলোকের দেশে কেউ ডাক্তারি করে ?

আমিন ডাক্তার থেমে বলল, ওর হইছে কী ?

কিছু বুঝতে পারছেন না ?

না।

হুঁ। ওর কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। শরীরে পানি এসেছে, হাসপাতালেও কিছু করতে পারবে না।

কিছুই করনের নাই ?

না।

সিরাজুল ইসলাম উঠে পড়লেন। বেরুবার আগে বললেন, আমি নিজের নৌকা নিয়ে এসেছি। যদি যেতে চান যেতে পারেন।

এই রকম রোগী ফালাইয়া যাই ক্যামনে ?

থাকেন তাহলে।

সমস্ত দিন কাটল এইভাবে। রাত্রে অবস্থা খুব খারাপ হলো। আমিন ডাক্তার বিষণ্ন মুখে ঘরের দাওয়ায় বসে রইল। বেশ কয়েকবার ছেলের বাবাকে বলল, হাসপাতালে নেওন খুব দরকার। দিরং হইতাছে।

কেউ রোগী নাড়াচাড়া করতে রাজি হলো না। নিমতলীর পীর সাহেবকে আনতে নাকি লোক গিয়েছে। তিনি এসে যা বলেন তাই করা হবে। পীর সাহেব মাঝ রাত্রে পৌঁছলেন। ছোটখাটো হাসি-খুশি একজন মানুষ। রোগীকে হাসপাতালে নেওয়া ঠিক হবে কি-না জানতে চাইতেই বললেন, ডাক্তার সাব যদি নিতে কন তা হইলে নেওন লাগব। ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রোগী দেখে তাঁর মতো বদলাল। শান্তস্বরে বললেন, হাতে সময় বেশি নাই।

ভোররাত্রে ছেলেটি হঠাৎ সুস্থ মানুষের মতো মাথা তুলে বলল, শীত লাগে বাজান।

চার-পাঁচটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে আমিন ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, শীত কমেছে ?

ছেলেটি ফিসফিস করে বলল, শীত লাগে। জব্বর শীত লাগে। ও বাজান শইলডার মইধ্যে খুব শীত।

ফজরের আজানের পরপর ছেলেটি মারা গেল। ছেলের মা খুব কাঁদছিল। কে যেন বলল, কাইন্দেন না। মউতের কান্দন হাদিসে মানা আছে।

নিমতলীর পীর সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, দুখের সময় না কাঁদলে কোন সময় কাঁদব ? কান্দুক, খুব জুরে জুরে কান্দুক।

বাড়ির সামনে একটি কাঁঠাল গাছের নিচে দুপুর পর্যন্ত বসে রইল আমিন ডাক্তার। পকেটে কিছুই নেই যে একটা কেরাইয়া নৌকা নিয়ে বাড়ি ফেরে। এমন অবস্থায় কাউকে বাড়ি ফেরার কথাও বলা যায় না। পেটে অসম্ভব খিদে, মরা বাড়িতে চুলা ধরানো হবে না, কাজেই খাওয়াদাওয়া হবে কি না বলা মুশকিল।

দুপুরের রোদ একটু পড়তেই আমিন ডাক্তার হেঁটে চলে গেল নিমতলী, নিমতলী পৌঁছতে পৌঁছতে এক প্রহর রাত হলো। সেখান থেকে সোহাগী আসল জলিলের নৌকায়। তখন মাঝরাত্রি, ঘরে খাবার কিছুই নেই। একটি টিনে চিড়া সেটিও শূন্য। মতি মিয়ার বাড়িতে গেলে হতো। কিন্তু এই দুপুর রাত্রে যাওয়া ঠিক না।

খিদের জন্যে ঘুম আসে না। ঘরের ভেতর অসহ্য গরম। মশারিটি শত ছিদ্র। ভনভন করছে মশা। নতুন মশারি একটি না কিনলেই নয়। আমিন ডাক্তার শুয়ে শুয়ে কত কথাই না ভাবে। কত বিচিত্র কথা মনে আসে। সুখান পুকুরের এক রোগী মরবার আগে হঠাৎ খুব অবাক হয়ে বলেছিল, ঠান্ডা হাত দিয়া আমারে কে ছুঁইছে? ও ডাক্তার বড় শীত লাগে। বড় শীত লাগে। বড় শীত।

মরবার আগে সবারই শীত লাগে কি না আমিন ডাক্তারের খুব জানতে ইচ্ছা করে।

৭

নুরুদ্দীন খুঁজে খুঁজে চমৎকার একটি মাছ মারার জায়গা বের করেছে। বাড়ি থেকে সোয়া মাইল দূরে জঙ্গলা ভিটার ভাঙা ঘাট। জায়গাটি বড় নির্জন। দুপাশ অন্ধকার করে আছে ঘন কাঁটা বন। ভাঙা ঘাটের ফাঁকে ফুঁকে সাপের আড্ডা। সে জন্যেই বড় কেউ আসে না এ দিকটায়। ঘাটের লাগোয়া প্রকাণ্ড একটা ডেফল গাছে পাকা ডেফল টুকটুক করে। নুরুদ্দীন ছিপ ফেলে ডেফল গাছে হেলান দিয়ে সারা দুপুর বসে থাকে।

তার সঙ্গে প্রায়ই আসে অনুফা। সে নুরুদ্দীনকে বিরক্ত করে না। লম্বা একটি নারিকেলের ডোগা হাতে নিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে কীসব কথা বলে। নুরুদ্দীন মাঝে মাঝে ধমক দেয়, অ্যাই চুপ। অত কথা কইলে মাছ আইব?

অনুফা অল্প কিছু সময়ের জন্যে চুপ করে আবার গুনগুন শুরু করে।

অ্যাই অনুফা, পাগলি নাহি তুই?

অনুফা রাগ করে না। খিলখিল করে হাসে। নুরুদ্দীনের বড় মায়া লাগে।

মাছ মারার এই জায়গাটা নুরুদ্দীন খুব সাবধানে গোপন করে রাখে। ঘাস কাটার জন্যে খোন্দায় করে কৈবর্তপাড়ার মাঝিরা এই খাল দিয়ে বড় গাঙের দিকে যায়। শব্দ পেলেই ডেফল গাছের আড়ালে চট করে লুকিয়ে পড়ে নুরুদ্দীন। তবু কেউ কেউ দেখে ফেলে। তখন বড় ঝামেলা হয়।

এইডা কে? মতি ভাইয়ের পুলানা? এই, কী করস তুই?

মাছ মারি।

মাছ মারস ? মাথাডা খারাপ নাহি তর ? এইডা মাছ মারনের জায়গা ? যা বাড়িত যা।

মাছ মারার জন্যে জায়গাটা কিন্তু খারাপ না। আজকেও নুরুদ্দীন দুহাত লম্বা একটা বোয়াল মেরে ফেলল।

অনুফার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

ওব্বাসরে, এইডা তো জব্বর মাছ নুরু ভাই।

শক্ত কইরা মাথাডা ধর। পানিত যেন না পড়ে—সাবধান।

পাকা বর্শেলের মতো মুখ করে নুরুদ্দীন দ্বিতীয়বার ছিপ ফেলতে যায়। কিন্তু বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, এখন আর মাছে খাবে না। চল বাড়িত যাই অনুফা।

না।

না কী ? দিয়াম এক চড়, বিষ্টি পড়তাছে দেখস না ?

পড়ুক।

বলেই অনুফা মাছ হাতে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল। এই তার খেলা। দৌড়তে দৌড়তে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবে। কোথাও একদণ্ডের জন্যে থামবে না।

জঙ্গলা ভিটা থেকে বেরিয়ে নুরুদ্দীন দেখে খুব মেঘ করেছে। ডেফল গাছের আড়ালে থাকায় এতক্ষণ বোঝা যায়নি। নুরুদ্দীন দৌড়তে শুরু করল। অনেকখানি ফাঁকা জায়গা পার হতে হবে। রানীমার পুকুর পাড়ে উঠে আসার আগেই সে ভিজে ন্যাতা ন্যাতা হয়ে গেল। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে সিরাজ চাচার নতুন চালাঘর। লালচাচি ছুটোছুটি করে ধান তুলছে। শুকোতে দেওয়া ধানের বেশির ভাগই গেছে ভিজে। লালচাচি নুরুদ্দীনকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, নুরু হাত লাগা। তর চাচা আইজ খুব চেতব।

ধান তোলা শেষ হতেই বৃষ্টি থেমে গেল। লালচাচি হাসিমুখে বললেন, কাণ্ডটা কেমুন হইল নুরা ?

বিষ্টি আবার আইব চাচি।

ধান তো বেবাক ভিজছে নুরা। করি কী এখন ক দেহি ? একলা মানুষ আমি অত ধান শুকাইতে পারি ? তুই বিবেচনা কর দেহি। নুরুদ্দীন বেশ খানিকক্ষণ বসে রইল লালচাচির ঘরে। লালচাচিকে সে বেশ পছন্দ করে। নুরুদ্দীনের ধারণা লালচাচির মতো সুন্দরী (এবং ভালো) মেয়ে সোহাগীতে আর একটিও নেই। সবচেয়ে বড় কথা, লালচাচি তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন সে একজন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি।

ও নুরা, তোর চাচারে কইলাম আমার ছোড ভাইটারে আইন্যা রাখতে, কাজকামে সাহায্য হইব। তোর চাচা কী কয় জানস ?

কী কয় ?

কয়—চোরের গোষ্ঠী আইন্যা লাভ নাই।

কথাডা ঠিক অয় নাই চাচি, অলেহ্য হইছে।

আমার দাদা চোর আছিল এইডা অস্বীকার যাই ক্যামনে ? কিন্তুক হেইডা কোন আমলের কথা। পুরানা কথা তুইল্যা মনে কষ্ট দেওন কি ঠিক ?

না, ঠিক না চাচি।

হেইদিন তরকারির লবণ এট্টু বেশি হইছে, তোর চাচা কয় চোরের গোষ্ঠী রান্দাবাড়া শিখনের তো কথা না।

কথাডা অলেহ্য হইছে চাচি।

অত চোর চোর করলে বিয়া করল ক্যান ? আমি কি পায়ে ধইরা সাধছিলাম ?

ঠিক কথা চাচি।

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। লালচাচি কিছুতেই ছাড়বে না। বাপের বাড়ির পুরনো সব গল্প আবার শুনতে হলো। গুড় দিয়ে একথালা মুড়ি খেতে হলো।

বাড়ি ফিরে নুরুদ্দীনের মুখ শুকিয়ে গেল। আজরফ নাকি তাকে বেশ কয়েকবার খোঁজাখুঁজি করেছে। আজরফকে আজকাল সে খুব ভয় পায়। আজরফ তাকে কিছুই বলে না। তবু কেন জানি ভয় ভয় লাগে। শরিফা বলল, বৃষ্টি বাদলা না হইলে রাইতে ধান মাড়াই দিতে চায়। তরে খুঁজছিল। কী যেন কইতে চায়।

কী করতে চায় ?

জিগাই নাই। অত কথা আমি জিগাই না।

নুরুদ্দীনের মনে হলো শুধু সে একা নয়, তার মা নিজেও আজকাল আজরফকে সমীহ করে চলে।

বন্দের মইধ্যে গিয়া জিগাইতাম ?

যা, জিগা গিয়া।

উত্তর বন্দে আজ খুব কাজের ঘটা। ফিরাইল সাব বলেছেন দুএকদিনের মধ্যে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হবে। সেই শিলা ফেরাবার ক্ষমতা তাঁর নেই। কাজেই সম্ভব হলে আজকের মধ্যেই যেন ধান তুলে ফেলা হয়। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। মশা তাড়াবার জন্যে ভেজা খড় পুড়িয়ে ধোঁয়া করা হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জ্বলন্ত খড়ের দড়ির কাছে হুকো হাতে দাঁড়িয়ে আছে। খুব কাজের চাপ তাদের। ডাক পড়তেই হুকো নিয়ে ছুটে যেতে হচ্ছে। ধানকাটার পুরা দলটি বৃষ্টিতে ভিজে জবজব। উত্তর বন্দেও আধ হাতের মতো পানি। ঘনঘন হুকার টান দিয়ে শরীর চাঙা করে নিতে হয়। উজান দেশের বেশ কিছু কামলা এসেছে ধান কাটতে। এদের হয়েছে অসুবিধা। দিন-রাত পানিতে থাকার অভ্যাস না থাকায় হাত পা হেজে গিয়েছে। তারা ক্ষণে ক্ষণে কাজ ফেলে শুকনায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আজরফকে খুঁজে বের করতে বেশ দেরি হলো। উত্তর বন্দে আজ সবাই ধান কাটছে। অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় লোকজন চেনা যাচ্ছে না। তার ওপর আজরফ কার জমিতে কাজ করছে তাও ঠিক জানা নেই। তাদের নিজেদের জমির সবটাই পুব বন্দে। নুরুদ্দীন গলা উঁচিয়ে ডাকল, ও ভাইসাব। খুব কাছ থেকে উত্তর হলো, এইদিকে আয় নুরা।

আমারে নি খুঁজছিলা ?

আজরফ কাজ থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। লুঙ্গির গোঁজ থেকে একটা কাগজ বের করে বলল, বাজানের চিঠি। জলিল মাঝির সাথে পাঠাইছে। ডাক্তার চাচারে দিয়া পড়াইয়া আন।

আইচ্ছা।

আর হুন আইজ ধান মাড়াই হইব।

কোন সময় ?

রাইত।

গরু পাইবা কই ?

কালাচান চাচারে কইয়া রাখছি। তুই আরেকবার গিয়া জিগা।

আইচ্ছা।

যা, বাড়িত যা।

ভাত খাইতা না ?

আইজ সরকারবাড়িত খাইয়াম। হেরার ধান কাটতাছি।

একটা বোয়াল মাছ মারছি দুই আত লম্বা।

আজরফ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, জঙ্গলাবাড়ির ভিটাত আর যাইস না নুরা। জায়গাডা খারাপ। দোষ আছে। হের ওপরে আবার সাপের উপদ্দপ।

নুরুদ্দীনের মুখে কথা ফুটে না। তার গোপন জায়গার কথা আজরফ কীভাবে জানল কে জানে।

বাড়িত যা নুরা।

উত্তর বন্দ থেকে একা একা বাড়ি ফিরতে নুরুদ্দীনের বড়ই ভালো লাগে। এতবড় বন্দ এই অঞ্চলে আর নেই। দিনরাত হাওয়ায় শোঁ শোঁ শব্দ তোলে। উত্তর পশ্চিমে তাকালে কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু মনে হয় দূরের আকাশ নেমে এসেছে মাটিতে। পুব দিকে তাকালে নিমতলী গ্রামের সীমানার তালগাছ দুটো আবছা চোখে পড়ে। তালগাছ দুটিতে দোষ আছে। গভীর রাত্রে মাছ মারতে এসে অনেকেই দেখেছে, একটা জাম্বুরার মতো বড় আগুনের গোলা গাছ দুটির মাথায়। এ গাছ থেকে ও গাছে যাচ্ছে আবার ক্ষণে ক্ষণে মিলিয়েও যাচ্ছে।

আমিন ডাক্তার বাড়ির পেছনে খোলা চুলায় রান্না চাপিয়েছে। রান্নার আয়োজন নগণ্য। ঝিঙ্গে ভাজি আর খেসারির ডাল। ভেজা কাঠের জন্যে প্রচুর ধোঁয়া উঠছে চুলা থেকে। নুরুদ্দীন গিয়ে দেখে, একটা কাঠের চোঙায় মুখ দিয়ে আমিন ডাক্তার প্রাণপণে ফুঁ দিচ্ছে। তার নিজের চোখমুখ লাল, কী রে নুরা কী চাস ? ভাত খাইবি ?

নাহ।

না কীরে ব্যাটা। ঝিঙ্গে ভাজা করলাম। গাওয়া ঘি আছে দিয়ামনে এক চামুচ।

আইজ না চাচাজি। বাজানের একটা চিঠি আনছি, পইড়া দেন।

মতি মিয়া নিজেও লেখাপড়া জানে না। কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে—

আজরফ মিয়া দোয়াগো,

আশা করি পরম করুণাময় আল্লাহতালার কৃপায় সুস্থ শরীরে শান্তিমতো আছ। পর সমাচার এই যে, আমরা দল লইয়া অতি শীঘ্র নেত্রকোনা যাইতেছি। বিবেকের গান খুব নাম কামাইয়াছে। স্বয়ং কানা নিবারণও বলিয়াছে—গলা খুব উত্তম। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুরাতন বিবেক ফিরিয়া আসিয়াছে। কাজকর্ম ঠিকমতো করিবা। নতুন ধান উঠিবা মাত্র আমাকে নিম্ন ঠিকানায় বিশটি টাকা অতি অবশ্য পাঠাইবা। কিঞ্চিৎ আর্থিক অসুবিধায় আছি। আজ এই পর্যন্ত। ইতি।

আমিন ডাক্তার চিঠি শেষ করে ভ্রু কুঞ্চিত করে রইল। চিঠিতে কবে ফিরবে কোনো উল্লেখ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, শরিফার কোনো কথা নেই।

আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, তর মায়ের কথাও লেখছে কোনা দিয়া—তোমার মাতার কথাও সর্বদা স্মরণ হয়। তুমি তাহার যথাসাধ্য যত্ন করিবা। নুরা তোর মায়েরে কইছ। তার কথাও লেখা।

আইচ্ছা। আর চাচাজি আইজ আমরার ধান মাড়াই। আপনের যাওন লাগব।

দেহি।

দেহা দিহি নাই, যাওন লাগব।

রুগি-টুগি না থাকলে যাইয়ামনে এক ঘুরান।

ধান মাড়াইয়ের ব্যাপারে নুরুদ্দীনের খুব উৎসাহ।

মাঝরাতের দিকে চাঁদ উঠার সঙ্গে সঙ্গে ধান মাড়াই শুরু হবে। চলবে সারা রাত। একজন পালা করে থাকবে গরুর পেছনে অন্য সবাই দল বেঁধে উঠোনে বসে গল্প শুনবে। গল্প বলার জন্যে কথক আছে। তাদের বড় দাম এই রাত্রে। পান তামাকের ডালা খোলা। শেষরাত্রে পিঠে-চিড়ার ব্যবস্থা।

নুরুদ্দীনের খুব ইচ্ছা এবারও গতবারের মতো আলাউদ্দীনকে খবর দেওয়া হয়। পেশায় সে চোর, কিন্তু তার মতো বড় কথক ভাটি অঞ্চলে আর নেই। সে যখন

কোমরে লাল গামছা পেঁচিয়ে দুহাত নেড়ে কিচ্ছা শুরু করে তখন নিঃশ্বাস ফেলতে পর্যন্ত মনে থাকে না :

শোনেন শোনেন দশজনাতে
শোনেন দিয়া মন
লাল চাঁন বাদশার কথা হইয়াছে স্মরণ

তারপর হেই লাল চাঁন বাদশা উজির সাবরে ডাইক্যা কইল, ও উজির একটা কথার জবাব দেও দেহি।

বাড়ি ফিরে নুরুদ্দীনের খুব মন খারাপ হলো। কথক আলাউদ্দীন নিমতলী গিয়েছে। সন্ধ্যায় ফেরবার কথা এখনো ফেরেনি। যদি না ফিরে ? তারচেয়ে বড় কথা শরিফা রেগে গিয়ে খড়ম ছুড়ে মেরেছে অনুফার দিকে। সেই খড়ম কপালে লেগে রক্তারক্তি কাণ্ড। অনুফা বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে। রহিমা মুখ কালো করে ঘরের কাজকর্ম করছে। নুরুদ্দীন অনুফার খোঁজে বেরুল। সে কোথায় আছে তা জানা। ছোট গাঙের পারে জলপাই গাছের কাছে এসে নুরুদ্দীন ডাকল, ও অনুফা।

অনুফা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল।

আয় বাড়িত যাই।

অনুফা কোনো আপত্তি করল না।

বড় আন্ধাইর, হাত ধর অনুফা।

অনুফা এসে হাত ধরল। নুরুদ্দীন বলল, আইজ ধান মাড়াই, জানস ?

জানি।

আলাউদ্দীন আইত না।

অনুফা মৃদুস্বরে বলল, আইব।

কী কস তুই ?

দেখবা তুমি, আইব।

তুই খুব পাগলি অনুফা।

অনুফা খিলখিল করে হাসল। কিন্তু কী আশ্চর্য বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল আলাউদ্দীন তার দল নিয়ে এসে পড়েছে। চাঁদ এখনো ওঠেনি। অন্ধকারেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আলাউদ্দীনের রোগা লম্বা শরীর। সে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে হুকা টানছে।

কিচ্ছা শুরু হলো অনেক রাত্রে। গ্রামের অনেকেই এসেছে। আজরফ হচ্ছে ঘরের কর্তা। পান তামাক এগিয়ে দিচ্ছে। বৌ-ঝিরা ভেতর বাড়িতে। আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য চৌধুরী সাহেবও এসেছেন। তাঁর জন্যে চেয়ার আনা হয়েছে।

আলাউদ্দীন কোমরে লাল গামছা পেঁচিয়ে কিচ্ছা শুরু করেছে। সেই পুরনো লাল চাঁন বাদশার গল্প। কিন্তু এ গল্প কি আর সত্যি সত্যি পুরনো হয় ?

(গীত)

শোনেন শোনেন দশ জনাতে
শোনেন দিয়া মন
লাল চাঁন বাদশার কথা হইয়াছে স্মরণ।
লাল চাঁন বাদশার মনে বড় দুক্ষ ছিল,
বার বচ্ছর পার হইল পুত্র না জন্মিল।
লাল চাঁনের দুক্ষ দেইখ্যা কান্দে গাছের পাতা...

৮

উত্তর বন্দের সমস্ত ধান কাটা হওয়ার পরপরই 'ফিরাইল সাব' চলে গেলেন। যাওয়ার পরদিন প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হলো। তা তো হবেই 'মাঠ বন্ধন' নেই। শিলা আটকাবার আসল লোকই নেই। কালাচান খবর নিয়ে এল—ফিরাইল সাবের জন্যে উত্তর বন্দে যে খড়ের ছাউনি করা হয়েছিল তার চিহ্নমাত্র নেই। শিলাবৃষ্টিতে সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সোহাগীর লোকজন স্তম্ভিত।

ফিরাইলের সাবের উপরে রাগ রইছে, বুঝলা না বিষয়টা ?

রাগ থাকাটাই স্বাভাবিক। ফিরাইল সাব এই বৎসর উত্তর বন্দে শিল পড়তে দেননি। সমস্ত নিয়ে ফেলেছেন নিমতলীর বন্দে। ফিরাইল সাব বিদায় নেওয়ার আগে গ্রামে এসে উঠলেন কিছুক্ষণের জন্যে। গ্রামের বউ ঝিরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে অবাক হয়ে তাকায়। দেখেই বুঝা যায় বড় সহজ লোক ইনি না। তার সাথে চালাকি চলবে না। শুকনো দড়ি পাকান চেহারা। মাথার লম্বা চুলে জট বেঁধে গিয়েছে। জীয়ল গাছের শিকড়ে তৈরি একটি বাঁকা লাঠি। ফিরাইল সাব যাওয়ার আগে বারবার বলে গেলেন নিমতলীর তালাগাছের নিচে তিনটা বড় শউল মাছ পুড়িয়ে ভোগ দিতে। তালগাছে যে বিদেহী প্রাণীটি বাস করে তাকে তুষ্ট রাখা খুবই প্রয়োজন। বাজ পড়ে যদি তালগাছ দুটির একটিও পুড়ে যায় তাহলে সমূহ বিপদ। বিপদ যে কী তা তিনি ভেঙে বললেন না। পোয়াতি মেয়েছেলেদের ওপর কঠোর নির্দেশ—তারা যেন কোনোক্রমেই অমাবশ্যা এবং পূর্ণিমা এই দুই চাঁদে উত্তর বন্দে না যায়।

এ বৎসর খুব ভালো ফলন হয়েছে সোহাগীতে। লগ্নির ধান দেওয়ার পরও ধান রাখার জায়গা নেই। আবুল কালামের মতো হতদরিদ্র ভাগি চাষিরও খোরাকি ছাড়াই পঁচিশ মণ ধান হলো। এমন অবস্থায় জমকালো বাঘাই সিন্নি হবে তা বলাই বাহুল্য। ধান কাটা শেষ হওয়ার পরই প্রথম পূর্ণিমায় বাঘাই সিন্নির দল বেরুল। এইসব সাধারণত

ছেলে ছোকরার ব্যাপার। কিন্তু আমিন ডাক্তারের সে খেয়াল নেই। দলের পুরোভাগে সে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেচে কুঁদে এক হুলস্থুল ব্যাপার। মূল গায়ক একজন, অন্য সবাই ধুয়া ধরে।

(মূল গীত)

আইলাম গো

যাইলাম গো

বাঘাই সিন্নি চাইলাম

(ধোয়া) চাইলাম গো। চাইলাম গো।

এই পর্যায়ে হাত-পা ছুড়ে নাচ শুরু হয়। মেয়েরা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে বাঘাই সিন্নির জন্যে ধামাভর্তি চাল বের করে দেয়।

আমিন ডাক্তারকে দেখে বয়স্কদের অনেকেই দলে ভিড়ে গেল। সুবহান আলীর মতো রাশভারি মাতব্বর পর্যন্ত বাঘাই সিন্নির গানের ধুয়ায় শামিল হলো।

সিন্নির আয়োজন হয়েছে উত্তর বন্দে। চারদিকে ফকফকা জ্যোৎস্না। দূরে সোহাগী গ্রাম ছবির মতো দেখা যায়। খোলা প্রান্তরে হাওয়া এসে শোঁ শোঁ বোঁ বোঁ শব্দ তোলে। বাঘাই সিন্নি দলের উৎসাহের কোনো সীমা থাকে না। একদিকে সিন্নি রান্না হয় অন্যদিকে খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে বাঘাই সিন্নির গান হয়। বড়গাঙ্গ দিয়ে বিদেশী নৌকা যায়। তারা কৌতূহলী হয়ে হাঁক দেয়।

কোন গ্রাম ?

সোহাগী ?

বাঘাই সিন্নি নাকি গো ?

হ ভাই।

কেমন জমল ?

জব্বর।

হই হো হেই হো।

শুধু খোরাকির ধান রেখে বাকি সব ধান আজরফ নীলগঞ্জের হাটে বিক্রি করে দিল। শরিফা আপত্তি করছিল। কিন্তু আজরফ শক্ত সুরে বলল, ধান থাকলেই খরচ হইব। যে জিনিসের দরকার নেই সেইটিও কিনা হইব।

যুক্তি অকাট্য। ইতোমধ্যে নৌকা সাজিয়ে বেদেনীরা আসতে শুরু করেছে। শাড়ি চুড়ি থেকে শুরু করে পিঠা বানানোর ছাঁচ কী নেই তাদের কাছে ? কিনতে কারও গায়ে লাগে না। নগদ টাকা দেওয়ার ঝামেলা নেই, ধান দিলেই হয়।

আজরফ নীলগঞ্জের হাটে ধান বেচে কত টাকা পেল তা শরিফা পর্যন্ত জানতে পারল না। শরিফা খুব বিরক্ত হলো কিন্তু নিজে থেকে জানতে চাইল না।

টাকাপয়সার হিসাব পুরুষ মানুষের কাছে থাকাই ভালো। আর এই সংসারে পুরুষ বলতে তো এখন আজরফই আছে। কয়েকদিনের মধ্যেই যেন ছেলেটা বড় হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে চলাফেরা করে। যন্ত্রের মতো কাজ করে। নীলগঞ্জ থেকে সে এবার অনেক জিনিসপত্র কিনেছে। নুরুদ্দীনের জন্যে এসেছে লুঙ্গি আর মাছ মারার বড়শি। তার এবং রহিমার জন্যে এসেছে শাড়ি। শরিফা দুঃখিত হয়ে লক্ষ করল, দুটি শাড়ির জমিনই একরকম। দামও নিশ্চয়ই এক। রহিমা তার কে ? থাকতে দেওয়া হয়েছে দয়া করে এর বেশি আর কী ? তার জন্যে সস্তার শাড়ি কি নীলগঞ্জের হাটে ছিল না ? শুধু এখানেই শেষ না, অনুফার জন্যে সে একটা জামাও এনেছে। জামার বড়বড় ছাপার ফুল। ম্যালা দাম নিশ্চয়ই।

বর্ষা এসে গেছে।

কদিন ধরেই ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাটে একহাঁটু কাদা। আজরফ ঘরেই বসে থাকে। করার তেমন কিছু নেই। আগামী পাঁচ মাস ধরে জোয়ান মর্দ ছেলেরা ফড় খেলবে ষোলো ঘুঁটি খেলবে। কেউ কেউ ফুর্তির খোঁজে চলে যাবে উজান দেশে। এই পাঁচ বিশ্রামের মাস ফুর্তির মাস।

শরিফা খবর পেল। আজরফ যাচ্ছে উজান দেশে। কী সর্বনাশের কথা এইটুকু ছেলে সে যাবে উজানে। উজানের মেয়েগুলি ফষ্টিনষ্টিতে ওস্তাদ, কী থেকে কী হবে কে জানে। তার ওপর বাজারের খারাপ মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়লে ফতুর হয়ে আসতে হবে। কিন্তু আজরফের উদ্দেশ্য ভিন্ন। সে কাজকর্মের খোঁজে যাবে। উজানমুলুক থেকে কিছু টাকাপয়সা যদি আনা যায় তাহলে ধান বেচা টাকার সঙ্গে যোগ করে জমি রাখা যাবে। শরিফা স্তম্ভিত।

আমরারে দেখাশোনা করব কে ?

নুরা আছে। রহিমা খালা আছে। তারা দেখব।

শরিফা কাঁদে খুন খুন করে। আপন মনে বিড়বিড় করে, রক্তের মধ্যে দোষ। ঘরে মন টিকে না। রহিমাকে আড়ালে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, ছেলেডা কি বিয়া করতে চায় ?

রহিমা মুখে কাপড় দিয়ে হাসে। বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলে, না বুজি।

হাসস ক্যান রহিমা ? হাসির কথা কিছু কই নাই। বিয়া যখন করত চায় তখন পুলাডি এই রকম ঘর ছাড়নের ভয় দেখায়।

না বুজি, বিয়া করব কী ? বাচ্চাপুলা।

আজরফকে এখন আর বাচ্চাপুলা বলা যায় না।

গম্ভীর হয়ে দাওয়ায় যখন বসে থাকে শরিফার পর্যন্ত সমীহ করে কথা বলতে ইচ্ছা করে।

এর মধ্যে হঠাৎ মতি মিয়ার একটি চিঠি এসে উপস্থিত। শম্ভুগঞ্জ থেকে লেখা। আমিন ডাক্তার এসে ঠিঠি পড়ে দিয়ে যায়।

মদন থানার রাধাপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে একটি সোনার মেডেল দিয়েছেন। মেডেলটি ছয় আনি ওজন।

মেডেলের ব্যাপারটি সর্বৈব মিথ্যা। রুপার একটি মেডেল সাড়ে তিন টাকা খরচ করে মতি মিয়া নিজেই কিনেছে। আসরে নামার সময় গায়ে কোনো মেডেল না থাকলে লোকজনের ভক্তি পাওয়া যায় না। আমিন ডাক্তারকে চিঠিটি তিন-চারবার পড়ে শোনাতে হয়। সেই রাত্রে তাকে খাওয়াদাওয়াও করতে হয়। ডাক্তার হৃষ্টচিত্তে শরিফাকে বলে, বুঝছেননি দোস্তাইন, মতি মিয়া কানা নিবারণরে ছাড়াইয়া যাইব কইয়া রাখলাম।

শরিফাকে এই সংবাদে খুব উল্লসিত মনে হয় না।

বর্ষার জন্যে অসুখবিসুখ হতে শুরু করেছে।

পেট খারাপ, জ্বর অসুখ বলতে এই দুটিই। মানুষের হাতে টাকা আছে। কিছু হতেই ডাক্তারের ডাক পড়ে। কাজেই আমিন ডাক্তারের ভালো সময় যাওয়ার কথা। কিন্তু তা যাচ্ছে না। বর্ষার আগে আগে নতুন একজন ডাক্তার এসে পড়েছে।

এই অঞ্চলের লোকদের হাতে যখন টাকাপয়সা থাকে তখন হঠাৎ করে শহুরে ডাক্তার এসে উদয় হয়। লোকদের টাকাপয়সা যখন কমে আসতে শুরু করে তখন বিদেয় হয়। আগেও এরকম হয়েছে। এতে আমিন ডাক্তারের তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। সোহাগীর লোকজন পুরান ডাক্তারকেই ডাকে। কিন্তু এই বছর অসুবিধা হচ্ছে। নতুন যে ডাক্তার এসেছেন তিনি সোহাগীর লোকজনদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন।

ডাক্তারটির নাম শেখ ফজলুল করিম।

এসেছেন মোহনগঞ্জ থেকে। সেখানে ডাক্তার সাহেবের বড় ফার্মেসি আছে, 'শেখ ফার্মেসী'। ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে যে অ্যাসিসট্যান্ট এসেছে সে আরেক বিস্ময়, লোকটির বাড়ি জৌনপুরে। বাংলা বলতে পারে না। সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার সাহেবের ঘরের উঠোনে বসে সুর করে তুলসী দাসের রামচরিত মানস পড়ে। ডাক্তার সাহেব নিজেও কম বিস্ময় সৃষ্টি করেননি। তিনি সঙ্গে একটি ঘোড়া নিয়ে এসেছেন। এই বৃষ্টি বাদলার দিনে ঘোড়া কী কাজে লাগবে জিজ্ঞেস করলে উচ্চস্বরে হেসে বলেছেন, শীতকালের জন্যে ঘোড়া আনা হয়েছে। তার মানে লোকটি শুধু বর্ষার সময়ের জন্যে আসেনি, দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে। মানুষ হিসেবে অত্যন্ত মধুর স্বভাব। কদিন হয় এসেছেন এর মধ্যেই গ্রামের সবার নাম-ধাম জানেন। দেখা হলেই খোঁজখবর করেন। ওষুধের জন্যে গেলে প্রথমেই বলেন, বিনা পয়সায় ওষুধ দিতে পারি, কিন্তু ওষুধে কাজ হবে না। পয়সা দিয়ে ওষুধ নিলে তবেই ওষুধ কাজ করে। গ্রামের সবার ধারণা কথাটি খুব 'লেহ্য'।

ডাক্তার সাহেবের কাছে সপ্তাহে একটি কাগজ আসে 'দেশের ডাক'। তিনি উচ্চস্বরে সেই কাগজ পড়ে শোনান। পড়া শেষ হলে চিন্তিত মুখে বলেন, 'ইস দেশের সর্বনাশের আর বাকি নাই'। গ্রামের লোকজন সর্বনাশের কারণ ঠিক বুঝতে পারে না কিন্তু ডাক্তার সাহেবের বিদ্যা বুদ্ধিতে চমৎকৃত হয়।

আমিন ডাক্তার মহাবিপদে পড়ে গেল। রোগী পত্তর একেবারেই নেই। পাওনা টাকাপয়সাও কেউ দিচ্ছে না। সোহাগীর লোকজন যেন ভুলেই গেছে এই গ্রামে আমিন ডাক্তার নামে পুরান একজন ডাক্তার আছে। সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে অনেক ফন্দিফিকির করে, কোনোটাই কোনো কাজে আসে না। যেমন, একদিন সকালে সেজেগুজে গম্ভীর মুখে তার ব্যাগ হাতে বেরুল। যার সঙ্গে দেখা হলো তাকেই বলল, নিমতলী থেকে 'কল' এসেছে। রোগীর অবস্থা এখন তখন। আমিন ডাক্তারকে ছাড়া ভরসা পাচ্ছে না। বিশেষ করে নিমতলীর কথা বলার কারণ হচ্ছে, নিমতলীতে সিরাজুল ইসলামের মতো নামি ডাক্তার থাকেন।

আষাঢ় মাসের গোড়াতেই আমিন ডাক্তার মহামুছিবতে পড়ল।

না খেয়ে থাকার যোগাড়। একদিন চৌধুরী সাহেব এসে দেখেন, আমিন ডাক্তার দুপুরবেলা শুকনো চিড়া চিবাচ্ছে। তিনি বড়ই অবাক হলেন। ভাটির দেশে ভাতের অভাব নাই আর এখন সময়টাই হচ্ছে ফেলে ছড়িয়ে খাবার। চৌধুরী সাহেব গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রোজগারপাতি কেমুন ডাক্তার ?

ইয়ে, আছে কোনো মতো।

হুঁ।

কলেরা শুরু হইলে কিছু বাড়ব। ওখন কম।

চৌধুরী সাহেব যাওয়ার আগে বলে গেল সে যেন অতি অবশ্যি আজ রাত থেকে দুবেলা তার ওখানে খায়। আমিন ডাক্তারের চোখে পানি এসে গেল। সন্ধ্যাবেলা সে গেল নতুন ডাক্তার শেখ ফজলুল করিম সাহেবের কাছে। 'দেশের ডাক' কাগজটি এসেছে। সেইটি পড়া হচ্ছে। প্রচুর লোকজন ঘরে। ফজলুল করিম সাহেব আমিন ডাক্তারকে খুব খাতির করলেন। আমিন ডাক্তার এক পর্যায়ে বলল, আপনের কাছে একটা পরামর্শের জইন্যে আসলাম ডাক্তার সাব।

কী পরামর্শ ?

এই গ্রামে একটা ইস্কুল দিতাম চাই।

আপনি ডাক্তার মানুষ, আপনি ইস্কুল কী দিবেন ?

ডাক্তারি আমি করতাম না। আমার চেয়ে ভালো ডাক্তার ওখন এই গ্রামেই আছে।

লোকজনকে অবাক করে দিয়ে আমিন ডাক্তার উঠে পড়ল। অনেক রাত্রে প্রথমবারের মতো খেতে গেল চৌধুরীবাড়ি। ছোট চৌধুরী বসে ছিল বারান্দায়।

তার গায়ে একটি সুতাও নেই। আমিন ডাক্তারকে দেখেই সে লাফিয়ে উঠল, এই শালা আমিন তরে আজই আমি খুন করবাম। শালা, তুই আমারে দেইখ্যা হাসছস। শালা তর বাপের নাম আজই ভুলাইয়া দিয়াম।

৯

বর্ষার প্রধান প্রস্তুতি শেষ হয়েছে।

সোহাগীর চারপাশে বাঁশ পুঁতে চাইল্যা গাছ ঢুকিয়ে মাটি শক্ত করা হয়েছে। প্রবল হাওয়ায় যখন হাওরের পানি এসে আছড়ে পড়বে সোহাগীতে তখন যেন মাটি ভেঙে না পড়ে।

উত্তর বন্দ সবচে নিচু। সেটি ডুবল সবার আগে। তারপর একদিন সকালে সোহাগীর লোকজন দেখল যেন মন্ত্রবলে চারদিক ডুবে গেছে। থই থই করছে জল। হুম হুম শব্দ উঠছে হাওরের দিক থেকে। জঙ্গলা ভিটার বাঁশ আর বেত বনে প্রবল হাওয়া এসে সারাক্ষণ বোঁ বোঁ শোঁ শোঁ আওয়াজ তুলছে। চিরদিনের চেনা জায়গা হঠাৎ করে যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। আদিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে সবুজ রঙের ছোট্ট 'সোহাগী'। নাইওরীদের আসবার সময় হয়েছে।

গভীর রাত্রে হাওরের নৌকার আলোগুলি কী অদ্ভুতই না লাগে। বিদেশী মাঝিরাও সোহাগীর দিকে অবাক হয়ে তাকায়। টেনে টেনে জিজ্ঞেস করে, কোন গ্রাম ? কো-ন-গ্র-া-া-ম ?

সোহাগী, গ্রামের নাম সোহাগী।

চারদিকে অথই জলের মাঝখানে ছোট্ট গ্রামটি ভেসে থাকে। চৌধুরীবাড়ির লোকজন সাদা কেরোসিন তেলের হারিকেন জ্বালিয়ে সারা রাত হিজল গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। গভীর রাত্রে যখন গ্রামের সব আলো নিভে যায় তখনো সেই আলো মিটমিট করে জ্বলে। দূর থেকে সেই আলো দেখে সোহাগীর নাইওরী মেয়েরা আহ্লাদে নৌকা থেকে চেঁচিয়ে ওঠে।

ওই আমার বাপের দেশ—ওই দেখা যায় চৌধুরীবাড়ির লণ্ঠন। গাঢ় আনন্দে তাদের চোখ ভিজে ওঠে।

ছেলেপুলেদের আনন্দের সীমা নেই। এখন বড়ই সুসময়। পানিতেই তাদের সারা দিন কাটে। এখন ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও কেউ কিছু বলবে না। বরং খুশিই হবে। পানির সঙ্গে পরিচয় হোক। একদিন এদেরই তো ঝড়ের রাত্রে একা একা হাওর পাড়ি দিতে হবে।

আমিন ডাক্তার চৌধুরীবাড়ির একটি অন্ধকার কোঠায় তার ইস্কুল সাজিয়ে বসে থাকে। প্রথম দিনে গোটা কুড়ি ছাত্র ছিল, এখন এসে ঠেকেছে দুইজনে। কালা চানের ছোট ছেলে বাদশা মিয়া আর কৈবর্তপাড়ার গণেশ। অন্য ছাত্ররা পড়ে থাকে হাওরের

পানিতে। কার দায় পড়েছে আমিন ডাক্তারের অন্ধকার ঘরে বসে থাকার ? দুটি ছাত্রকে নিয়েই আমিন ডাক্তার মহা উৎসাহে লেগে থাকে। বাদশা মিয়া বোকার হদ্দ। আমিন ডাক্তার যখন ক'য়ের উপর আঙুল রেখে জিজ্ঞেস করে, এইটা কী ? বাদশা মিয়া তখন আকাশ পাতাল চিন্তা করে গম্ভীর হয়ে বলে, 'স্বরে আ'। আমিন ডাক্তার প্রচণ্ড চড় লাগায় কিন্তু বাদশা মিয়ার বিদ্যার্জনের স্পৃহা সীমাহীন। সে পরদিন আবার শ্লেট পেনসিল নিয়ে হাজির হয়। অন্যদিকে গণেশের পড়াশোনায় খুব মন। তাকে পড়াতে বড় ভালো লাগে। কী চমৎকার—বলামাত্রই সব শিখে ফেলে। দ্বিতীয়বার আর বলতে হয় না। কী সুন্দর গোটা গোটা হাতের লেখা।

চৌধুরীবাড়ি খেতে যেতে এখন আর আগের মতো লজ্জা লাগে না। চৌধুরীদের পাগলা ছেলের বৌটা খুব যত্ন করে। পর্দার আড়াল থেকে মধুর স্বরে বলে, আরেকটু মাছ নেন চাচাজি।

আর না মা।

না চাচাজি, নেন। আরেক টুকরা নেন।

তাকে মাছ নিতেই হয়।

ইচা মাছ আর চোকাইয়ের তরকারি কোনোদিন খাইছেন চাচাজি ?

না মা, খাই নাই।

খুব সুআদ। আমার বাপের দেশে করে।

একদিন কইরো।

জি আইচ্ছা।

তোমার বাপের দেশ কোথায় ?

বহুত দূর। গাঁয়ের নাম বেতসি। নবিনগর ইউনিয়ন।

ভাটি অঞ্চল ?

জি-না উজান দেশ।

খাওয়ার পর পান আসে। একটা কামলা এসে তামাক সাজিয়ে দিয়ে যায়। পর্দার আড়াল থেকে বৌটি বলে, পেট ভরছে চাচাজি ?

আলহামদুলিল্লাহ, খুব খাইছি।

আপনের যেটা খাওনের ইচ্ছা হয় আমারে কইবেন।

বৌটিকে আমিন ডাক্তারের খুব দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু চৌধুরীবাড়ির পর্দা বড় কঠিন পর্দা। দেখা হয় না। ভাত খেয়ে ফেরার পথে চৌধুরীর পাগল ছেলেটার সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা হয়। ছেলেটি হুঙ্কার ছাড়ে, কেডা যায় ? আমিন ডাক্তার ? এই শুওরের বাচ্চা এদিকে আয় তো।

আমিন ডাক্তার না শোনার ভান করে এগিয়ে যায়। পাগলটা দারুণ হইচই শুরু করে, এই শালা কথা কস না যে—এই শালা।

বৌটার কথা চিন্তা করে আমিন ডাক্তারের বড়ই খারাপ লাগে। রোজ ভাবে চৌধুরী সাহেবকে বলে ছেলেটাকে নিখল সাব ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। বলা আর হয় না।

ভাদ্র মাস। হঠাৎ মতি মিয়া ফিরে এল। তার গায়ে দামি একটা চাদর। মাথায় ঢেউ খেলানো বাবরি চুল। হলুদ রঙের একটা মটকার পাঞ্জাবিতে দুটি রুপার মেডেল ঝুলছে। মেডেল দুটির মধ্যে একটি সে সত্যি সত্যি পেয়েছে। কেরানীগঞ্জের এক বেপারি খুশি হয়ে দিয়েছে। মতি মিয়া এখন নাকি বড় গাতক।

সন্ধ্যার পর বাড়িতে লোকজন ভিড় করে।

মতি ভাই এট্টু গানবাজনা হউক। হুনলাম উজান দেশে তোমারে লইয়া কাড়াকাড়ি।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে থাকে।

শইলডা আইজ যুইত নাই। আইজ না।

বলামাত্রই এখন আর গানে টান দেওয়া যায় না। বড় গাতকদের মান থাকে না তাতে। বড় গাতকদের গান সাধ্য সাধনা করে শুনতে হয়।

একখান গাও মতি ভাই।

কাইল আইও, নিজের বান্দা গান হুনাইয়াম।

নিজে গান বান্দ ? কও কী মতি ভাই ?

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে থাকে। গ্রামের লোক বড়ই চমৎকৃত হয়।

কাইল কিন্তু বেবাক রাইত গান অইব, কী কও মতি ভাই ?

চানি রাইত আছে। বেবাক রাইত গান। বুদ্ধিটা কেমুন ?

দেখি।

চেষ্টাকৃত একটা গাম্ভীর্য বহু কষ্টে মতি মিয়াকে ধরে রাখতে হয়।

পরের রাতে মতি মিয়ার বাড়িতে কিন্তু কেউ আসে না। কারণ সন্ধ্যার কিছু আগে কোনো খবর না দিয়ে কানা নিবারণ হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে, আজ রাতটাই শুধু থাকবে। চৌধুরীদের বাংলায় বসেছে গানের আসর। ছেলে বুড়ো সব সন্ধ্যা থেকেই বসা। মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠেছে। একসময় কানা নিবারণ গানে টান দিল। গ্রাম্য দুঃখী মেয়ের চিরকালের গান। শ্রাবণ মাস চলে গিয়েছে, ভাদ্র মাসও যায় যায়। তবুও তো নৌকা সাজিয়ে বাপের দেশ থেকে আমাকে কেউ নাইওর নিতে আসল না।

গানের মাঝখানে একটি অল্পবয়েসী বউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মেয়েটিকে এ বছর কেউ নিতে আসেনি। তাকে কাঁদতে দেখে অনেকেই চোখে আঁচল দিল। কিন্তু কানা নিবারণকে এইসব কিছুই স্পর্শ করছে না। সে সমস্ত জাগতিক ব্যথা বেদনার উর্ধ্বে। ফকফকা জ্যোৎস্নায় গ্রামের সমস্ত দুঃখী বৌ-ঝিরা কানা নিবারণের মধ্য দিয়ে তাদের চিরকালের কান্না কাঁদতে লাগল,

শ্রাবণ মাস গেছে গেছে ভাদ্র মাসও যায়
জানি না কী ভাবেতে আছে আমার বাপ ও মায়

মতি মিয়া তার বাড়ির উঠোনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আজ রাতে সোহাগীর মানুষের আর তাকে প্রয়োজন নাই। রহিমা একসময় এসে বলল, ভাত দেই মতি ভাই ?

নাহ ক্ষিধা নাই। তুমি গান শুনতে গেলা না ?

রহিমা কথা বলল না। মতি মিয়া ধরা গলায় বলল, যাও কানা নিবারণের গান হুন গিয়া। বড় ওস্তাদ লোক। তার মতো গাতক আর হইত না।

মতি মিয়ার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সে দিন দশেক থাকবে ভেবে এসেছিল কিন্তু থাকল না। পরদিন ভোরেই শম্ভুগঞ্জ চলে গেল।

১০

জঙ্গলা ভিটায় এখন আর যাওয়া যায় না।

নাবাল জায়গা। আষাঢ় মাসের গোড়াতেই পানি উঠে গেছে। দক্ষিণ কান্দা দিয়ে খুব সাবধানে হেঁটে জলমগ্ন ভিটার আশেপাশে যাওয়া গেলেও এমন আর কেউ যায় না। দক্ষিণ কান্দায় খুব সাপের উপদ্রব হয়েছে। সিরাজ মিয়ার একটি বকনা বাছুর সাপের হাতে মারা পড়েছে।

তবু নুরুদ্দীন জঙ্গলা ভিটায় যাওয়ার জন্যে এক সকালে লালচাচির বাড়ি এসে উপস্থিত। লালচাচির খোন্দা নিয়ে সে যাবে জঙ্গলা ভিটায়। তার সঙ্গে গোটা দশেক 'লার বড়শি'। বড়শি কটি পেতে দিয়েই সে চলে আসবে। লালচাচি চোখ কপালে তুলে বলল, তোর মাথাডা পুরা খারাপ নুরা। এই চিন্তা বাদ দে।

লালচাচি নুরুদ্দীনের কোনো যুক্তিই কানে তুলল না। ব্যাপারটিতে যে ভয়ের কিছুই নেই খোন্দায় বসে থাকলে সাপ খোপ যে কিছুই করতে পারবে না লালচাচিকে তা বুঝানো গেল না। লালচাচি খুব রেগে গেল, এক কথা একশবার কইস না নুরা। আমারে চেতাইস না। আমার মন মিজাজ ঠিক নেই।

তাঁর মন মেজাজ ঠিক নেই কথাটি খুব সত্যি। গুজব শোনা যাচ্ছে সিরাজ মিয়া আরেকটি বিয়ে করবে। মেয়ে নিমতলীর, নফিস খাঁর ছোট মেয়ে। সিরাজ মিয়াকেও

দোষ দেওয়া যায় না। যখন বিয়ে করে তখন সে কামলা মানুষ। সরকারবাড়ি জন খাটত। ছোটঘরের মেয়ে ছাড়া কামলা মানুষের কাছে কে মেয়ে দিবে ? সেই দিন আর এখন নেই। নতুন ঘর তুলছে সিরাজ মিয়া। এই বছর টিনের ঘর দিবে। এক বান টিন কেনা হয়েছে।

এছাড়াও একটি কারণ আছে। সিরাজ মিয়ার এখনো কোনো ছেলেপুলে হয়নি। তিনটি বাচ্চা আঁতুড়ঘরে মারা গিয়েছে। অনেকের ধারণা সিরাজ মিয়ার বৌয়ের ওপর জিনের আছর আছে। লক্ষণ সব সেই রকম। প্রথমত সে অত্যন্ত রূপসী। বাছবিচারও নেই। ভর সন্ধ্যায় অনেকেই তাকে এলোচুলে ঘরে ফিরতে দেখেছে।

সিরাজ মিয়া অবশ্যি বিয়ের প্রসঙ্গে কিছুই বলে না। তবে তার হাবভাব যেন কেমন কেমন। ইদানীং সে প্রায়ই নিমতলী যায়। নৌকাবাইচের ব্যাপারেই নাকি তার যাওয়া লাগে। কিন্তু দৌড়ের নৌকা নিয়ে যাওয়ার সময় কেউ কি নয়া শার্ট গায়ে দেয় ?

লালচাচি নুরুদ্দীনকে বিকাল পর্যন্ত বসিয়ে রাখল। যতবারই নুরুদ্দীন উঠতে চায় ততবারই সে তাকে টেনে ধরে বসায়। নতুন এই সমস্যায় কী করণীয় সেই ব্যাপারে পরামর্শ চায়। যেন নুরুদ্দীন খুব একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। নুরুদ্দীন বড়দের মতো গম্ভীর গলায় বলে, চাচারে পানপড়া খাওয়াও।

পানপড়ার কথা লালচাচির অনেকবার মনে হয়েছে, কিন্তু এ গ্রামে পানপড়া দেওয়ার লোক নেই। ভিন্ন গ্রাম থেকে আনতে হবে। লোক জানাজানির ভয়ও আছে। লালচাচি হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে বলল, তুই আইন্যা দিতে পারবি ? সুখান পুকুরে একজন কবিরাজ হুনছি পানপড়া দেয়।

আইচ্ছা।

একলা যাওন লাগব কিন্তুক।

আইচ্ছা।

কেউরে কওন যাইত না। কাকপক্ষীও যেন না জানে।

কেউ জানত না।

নুরুদ্দীনের বড় মায়া লাগে। লালচাচির যে আবার বাচ্চা হবে তা সে জানত না। চোখমুখ সাদা হয়ে গেছে, হাত পা ভারী হয়েছে। চোখের নিচে কালি পড়ে এখন যেন আরও সুন্দর দেখায়, শুধু তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছা হয়। লালচাচি বলল, হা কইরা কী দেখস ?

তোমার বাচ্চা হইব চাচি ?

কথার ঢং দেখো। চুপ থাক।

নুরুদ্দীন একবার শেষ চেষ্টা করে—

চাচি দেও না তোমার খোন্দটা। যাইয়াম আর আইয়াম।

আইচ্ছা যা। দেইখ্যা আয় তর জঙ্গলা ভিটা। দিরং করিস না।

দিরং হইত না।

খোন্দায় উঠবার মুখে নুরুদ্দীন দেখল সোহাগীর দল তাদের বাইচের নৌকা নিয়ে মহড়া দিতে বেরিয়েছে। সিরাজ চাচা মাথায় একটি লাল গামছা বেঁধে নৌকার আগায়। নৌকা ছুটছে তুফানের মতো। গানের কথা শোনা যাচ্ছে—

ওগো ভাবিজান বাইচ বাইতে মর্দ লোকের কাম
ওগো ভাবিজান বাইচ বাইতে মর্দ লোকের কাম।

এইবারের বাইচে দুইটি খাসি এবং একটি গরু দেওয়া হয়েছে। আশেপাশের সাতটি গ্রামের মধ্যে কম্পিটিশন। ভাব সাব যা দেখা যাচ্ছে এ বৎসর সোহাগীর দল বোধহয় জিতেই যাবে।

জঙ্গলা ভিটাকে আর চেনা যায় না। পানিতে ডুবে একাকার। কেমন যেন একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ। বাঁশের ঝোপ আরও যেন ঘন হয়েছে। চারদিক দিনমানেই অন্ধকার। জঙ্গলা ভিটা ডুবিয়ে পানি ডেফল গাছের গুড়ি পর্যন্ত উঠেছে। খালের মাঝামাঝি লম্বা জলজ ঘাস জন্মেছে। সেইসব ঠেলে খোন্দা নিয়ে এগোনোই যায় না। নুরুদ্দীন ভেসে বেড়াতে লাগল। এক জায়গায় দেখা গেল চার-পাঁচটি থইরকল গাছ। এখানে থইরকল গাছ আছে তা কোনোদিন তার চোখেই পড়েনি। থোকা থোকা থইরকল পেকে লাল টুকটুক করছে। কী আশ্চর্য! নুরুদ্দীন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

এই সময় অদ্ভুত একটি কাণ্ড হলো। হঠাৎ চারদিক সচকিত করে থইরকল গাছ থেকে অসংখ্য কাক এক সঙ্গে কা কা করে উঠে গেল। উত্তর দিকের ঘন বাঁশবনে হাওয়ার একটা দমকা ঝাপটা বিচিত্র একটি হা হা শব্দ তুলল। তার পরপরই নুরুদ্দীন শুনল একটি অল্পবয়েসী মেয়ে যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক নিশ্চুপ। গাছের পাতাটিও নড়ে না। চারদিক সুনসান।

নুরুদ্দীন ভয় কাতর স্বরে বলল, কেডা গো, কেডা ?

আর তখন তার চোখে পড়ল জঙ্গলা বাড়ির ভিটার কাছে যেখানে জল শ্যাওলায় ঘন সবুজ হয়ে আছে সেখানে মাথার চুল এলিয়ে উপুড় হয়ে মেয়েটি ভাসছে। অসম্ভব ফর্সা তার একটি হাত ছড়ান। হাত ভর্তি গাঢ় রঙের চুড়ি। এই সময় প্রবল একটা বাতাস এল। মেয়েটি ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসতে লাগল নুরুদ্দীনের দিকে। যেন ডুবসাঁতার দিয়ে ধরতে আসছে তাকে।

আকাশপাতাল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরল নুরুদ্দীন। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। চোখ গাঢ় রক্তবর্ণ। লোকজন ঠিক চিনতে পারছে না। আমিন ডাক্তার এসে যখন জিজ্ঞেস করল, কী হইছে নুরু ?

নুরু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

কী হইছে ক দেহি নুরু ?

ভয় পাইছি চাচা।

কী দেখছস ?

একটা মেয়েমানুষ সাঁতার দিয়া আমারে ধরতে আইছিল। হাতের মইধ্যে লাল চুড়ি।

প্রচণ্ড ঝড় হলো সেই রাত্রে। ঘন ঘন বিজলি চমকাতে লাগল। কালাচান খবর আনল নিমতলীর দোষ লাগা তালগাছে বজ্রপাত হয়েছে।

পরদিন আমিন ডাক্তার নৌকা নিয়ে সারা দুপুর জঙ্গলা বাড়ির ভিটায় ঘুরে বেড়াল। কোথায়ও কিছু নেই। থইরকল গাছগুলি দেখে সে নুরুদ্দীনের মতোই অবাক হলো। উজান দেশের গাছ। ভাটি অঞ্চলে কখনো হয় না। গাছগুলিতে গাঢ় লাল রঙের ফল টুকটুক করছে। আমিন ডাক্তার আরও একটি জিনিস লক্ষ করল জঙ্গলা বাড়ির ভিটা পানিতে ডুবে গেছে। কোনো বছর এ রকম হয় না।

সোহাগীতে রটে গেল পাগলা নুরা ভরা সন্ধ্যায় গিয়েছিল জঙ্গলা বাড়ির ভিটাতে। গিয়ে দেখে পরীর মতো একটা মেয়ে নেংটা হয়ে সাঁতার কাটছে। নুরাকে দেখে সেই মেয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ডুবসাঁতার দিল।

নুরুদ্দীনের জ্বর সারতে দীর্ঘদিন লাগল। নিমতলীর পীর সাহেব নিজে এসে তাবিজ দিলেন। গৃহ বন্ধন করলেন। বারবার বলে গেলেন আর যেন কোনোদিন জঙ্গলা ভিটায় না যায়। জায়গাটাতে দোষ হয়েছে। নিমতলীর তালগাছে যে থাকত সে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। জঙ্গলা ভিটায় এসে তার আশ্রয় নেওয়া বিচিত্র না।

১১

সোহাগীতে পানি ঢুকছে এই ভয়াবহ খবরটি চৌধুরীদের পাগল ছেলে প্রথম টের পেল। তার রাতে ঘুম হয় না। বাংলা ঘরের বেঞ্চিতে বসে সিগারেট টানে এবং কোনোরকম শব্দ হলেই চেঁচায়, কেডা ? চোর নাকি ? এই চোর এই চোর। অ্যাইও। তার চেঁচামেচি চলে ভোর পর্যন্ত। ফজরের আজানের পর সে ঘুমাতে যায়। দুপুর পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমায়।

সেই রাত্রে সে উঠোনে পাটি পেতে শুয়েছিল। এবং তার স্বভাব মতো চোর চোর বলে চেঁচাতে চেঁচাতে শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন সমস্ত উঠোনে থৈথৈ পানি। শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে। শেয়াল ডাকাডাকি করছে চারদিকে। সে প্রথম কয়েক মুহূর্ত কিছুই বুঝতে পারল না। তার নিজস্ব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চেঁচাল কেডা চোর নাকি ? এই শালা চোর ? অ্যাইও। তার পরমুহূর্তেই 'পানি আসে পানি আসে' বলে বিকট চিৎকার করে ছুটতে শুরু করল। গ্রামের পশ্চিম

প্রান্তের গোয়াল ঘরগুলি থেকে গরু ডাকতে লাগল। বেশির ভাগ মানুষ জেগে উঠল এই সময়। ছোট মসজিদের ইমাম সাহেব রাত সাড়ে তিনটায় আজান দিলেন। অসময়ের আজান মহাবিপদের সংকেত দেয়। লোকজনের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। সরকারবাড়ি থেকে সরকার সাহেব দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দোনলা বন্দুক থেকে চার বার ফাঁকা আওয়াজ করলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করল।

আমিন ডাক্তার যখন ঘর থেকে বেরুল তখন তার উঠানে প্রায় হাঁটু পানি। এইরকম অসম্ভব ব্যাপার সোহাগীর মানুষ কখনো দেখেনি। ভাটি অঞ্চলে পানি এত দ্রুত কখনো বাড়ে না। আর বাড়লেও পানি এসে বাড়ির উঠানে কখনো ঢুকে না। আমিন ডাক্তার চৌধুরীবাড়ি এসে দেখে ইতোমধ্যেই প্রচুর লোকজন জড়ো হয়েছে। একটি হ্যাজাক লাইট উঠোনের জলচৌকির ওপর বসান। চৌধুরী সাহেব গলার শিরা ফুলিয়ে হাঁকডাক করছেন।

মেয়েছেলেগুলিরে সরকারবাড়িত লইয়া যাও। গরু ছাগলের দড়ি কাটো। জানো বাঁচানির চেষ্টা করো। ভেন্দার মতো চাইয়া থাইক্য না।

আমিন ডাক্তার দৌড়তে শুরু করল। মতি মিয়ার বাড়ি যাওয়া দরকার। পুরুষমানুষ কেউ নেই সেখানে। শরিফা সেরকম হাঁটা চলাও করতে পারে না। এতক্ষণ সে কথা মনেই হয়নি।

মতি মিয়ার বাড়ির উঠোনে অনেকখানি পানি। দক্ষিণ কান্দার একটি অংশ ভেঙে সর সর করে পানি ঢুকছে। উঠোনের বাঁদিকটা নিচু। সেখানে জলের একটা প্রবল ঘূর্ণি উঠেছে। আমিন ডাক্তার মতি মিয়ার বাড়িতে ঢুকে বেশ অবাক হলো। রহিমা সবকিছু নিপুণভাবে গুছিয়ে ফেলেছে। হাঁসমুরগি গরুছাগল সমস্তই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চৌকির নিচে ইট দিয়ে অনেকখানি উঁচু করে তার ওপর ধান রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় একটি বড় পোঁটলায় রাখা হয়েছে। শরিফা চৌকির এককোনায় বসে বসে কাঁদছিল। আমিন ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলল, ওখন কান্দনের সময় না দোস্তাইন। সরকারবাড়িত যাওন লাগব।

আমি কেমনে যাই ?

নেওনের ব্যবস্থা করতাছি। ওখন শরমের সময় না। হাতটা ধরেন দেহি।

সরকারবাড়ি কিন্তু যাওয়া গেল না। দক্ষিণ কান্দার ভাঙা অংশে জলের চাপ খুব বেশি। সরকারবাড়ি যেতে হলে ভাঙা জায়গাটা পেরুতে হয়। কৈবর্তপাড়ার জেলেরা সবাই চলে এসেছে দক্ষিণ কান্দায়। অনেকগুলি কুপি জ্বলছে সেখানে। চাটাই বিছিয়ে মেয়েরা সব উচ্চস্বরে কলরব করছে। শরিফাকে ওদের কাছে বসিয়ে রেখে আমিন ডাক্তার রহিমাকে আনতে গেল। রহিমা খুন্তি দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঘরের ভেতরে কী যেন খুঁজছে। আমিন ডাক্তারকে দেখে সে শান্ত স্বরে বলল, আজরফ এইখানে ধান বেচা টেকা লুকাইয়া রাখছে। পানি উঠলে সব নষ্ট হইব।

আমিন ডাক্তার বেশ অবাক হলো, তোমারে কইছিল সে এখানে লুকাইছে ?

না।

তুমি জানলা কেমনে ?

রহিমা জবাব দিল না। এক মনে খুঁড়াখুঁড়ি করতে লাগল।

ডাক্তার ভাই।

কী ?

আপনে অনুফা আর নুরুদ্দীনরে লইয়া যান, আমার দিরং হইব।

অনুফা নুরুদ্দীনের সঙ্গে চৌকিতে বসে খোঁড়াখুঁড়ি দেখছিল। সে মৃদুস্বরে বলল, হগলে মিল্যা একসঙ্গে যাইয়াম চাচা।

খুঁতিতে বাঁধা টাকা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। রহিমা বলল, আপনার কাছে রাখেন ডাক্তার ভাই।

আমার কাছে কেরে ?

মেয়ে মাইনসের হাতে টেকা থাকন নাই। দোষ হয়।

দক্ষিণ কান্দায় তারা যখন পৌঁছল তখন পুবদিক ফর্সা হতে শুরু করেছে। কান্দার পশ্চিম পাশে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে মিলে খুব হইচই করছে। কৈবর্তদের একটি ছেলে দৌড়াদৌড়ি করছিল। পা পিছলে নিচে পড়েছে। তাকে তুলে এনে শক্ত মার লাগান হচ্ছে। কৈবর্তদের প্রবীণ নরহরি দাস তামাক টানছে আর বলছে, শক্ত মাইর দেও। তামশা পাইছে।

আমিন ডাক্তার বলল, ও নুরা তোর মারে খুঁইজ্যা বাইর কর, খবরদার কান্দার কিনারাত যাইস না। এক চড় দিয়া দাঁত ফালাইয়া দিয়াম।

নুরুদ্দীন অনুফার হাত ধরে চক্ষের নিমেষে ছুটে গেল। আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে বলল, কারবারটা দেখছনি রহিমা, না করলাম যেটা হেইটা করন চাই।

রহিমা মৃদুস্বরে বলল, আপনের একটা কথা কইতাম চাই।

কী কথা ?

কথাডা আপনি কিন্তুক রাখবেন আমিন ভাই।

আমিন ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বলল, বিষয়ডা কী ?

অনুফারে নিখল সাব ডাক্তারের কাছে পাঠাইতাম চাই। হেইখানে ইস্কুল কলেজ আছে। লেহাপড়া শিখব।

আইজ হঠাৎ এই কথা কী কও ?

ডাক্তার ভাই পানি নামলে এই হানের অবস্থা খুব খারাপ হইব। আজরফের দুইডা পেট ভরনের ক্ষ্যামতা থাকত না।

তুমি তো অনেক দূরের কথা কও রহিমা।

নাহ, ডাক্তার ভাই দূরের কথা না।

নিখল সাব ডাক্তারের কাছে নিলে খিরিষ্টান হওন লাগে। হেই কথাডা জানত ?

জানি।

তুমি চিন্তাডা এট্টু বেশি করতাছ রহিমা। এই পানি থাকত না। যেমন হঠাৎ আইছে হেই রকম হঠাৎ যাইব।

ডাক্তার ভাই, এই পানি মেলা দিন থাকব।

কান্দার ঠিক মাঝখানে কারা যেন একটা আগুন করেছে। দুর্যোগের সময় মানুষ প্রথমে অকারণেই একটা আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করে। আজকের এই আগুনের অবশ্যি প্রয়োজন ছিল। ভেজা গা শুকোতে হবে। তাছাড়া বিলের দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আমিন ডাক্তার দেখল ফজলুল করিম সাহেব আগুনের কাছে এসে হাত মেলে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর এখানে আসার কথা নয়। তাঁর ঘরের কাছেই সরকারবাড়ি।

এই যে ও ভাই আমিন ডাক্তার, এ-কী অবস্থা ?

অবস্থাটা খারাপই, আপনে এতদূর আসলেন।

আমার ঘোড়ার খোঁজে আসছি। মরেই গেছে নাকি, কী বিপদ দেখেন তো ?

পাইছেন ঘোড়া ?

কই পাব বলেন ? ছিঃ ছিঃ, মানুষ থাকে এইখানে ?

নুরুদ্দীন আর অনুফা জারুল গাছের গুড়িতে চুপচাপ বসে আছে। গাছটি কান্দার ধার ঘেঁসে উঠেছে। নিচে তাকালেই পানির ঘোলা আবর্ত চোখে পড়ে। শরিফা বেশ কয়েকবার ডাকল, নুরু অত পানির ধার থাকিস না। কাছে আইসা ব।

নুরু গা করে না। ফিসফিস করে অনুফাকে কী যেন বলে। অনুফা খিলখিল করে হেসে ওঠে। শরিফা ধমকে ওঠে, হাসিস না। খবরদার। বিপদের মইধ্যে হাসি। কিছুই তোর মায় তরে শিখায় নাই ?

ভোরবেলা দেখা গেল ঘোলা পানি কান্দা ছুঁই ছুঁই করছে। নরহরি দাস মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ছাব্বিশ সনের বানের লাখান লাগে গো।

কৈবর্তদের চারটি নৌকা জারুলগাছের গুড়িতে শক্ত করে বাঁধা। আমিন ডাক্তার বেশ কয়েকবার বলেছে নৌকাতে করে সবাইকে সরকারবাড়িতে নিয়ে যেতে। সরকারবাড়ি অনেকখানি উঁচুতে। তাছাড়া পাকা দোতলা বাড়ি।

মেয়েছেলেরা সবাই দোতলায় থাকতে পারবে। কৈবর্তরা রাজি না। তারা দক্ষিণ কান্দাতেই থাকতে চায়।

সারা রাত ঝড়বৃষ্টি কিছুই হয়নি। সকালবেলা দেখা গেল আকাশে ঘন কালো মেঘ। দুপুরের পর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। নরহরি দাস চিন্তিত মুখে বারবার বলতে লাগল, গতিক খুব খারাপ। ভগবানের নাম নেন গো।

বিকালের দিকে বৃষ্টির চাপ কিছু কমতেই দেখা গেল ছোট ছোট খোন্দা নিয়ে সরকারবাড়ির কামলারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকারবাড়ির ছোট বৌ নাকি পানিতে পড়ে গেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি চলল। রাত প্রথম প্রহর পুহাবার আগেই কান্দার ওপর আধ হাত পানি উঠে গেল।

পানি থাকল সব মিলিয়ে ছদিন। এতেই সোহাগীর সর্বনাশ হয়ে গেল।

১২

ভাত না খেয়ে বাঁচার রহস্য সোহাগীর লোকজনের জানা নেই। চৈত্র মাসের দারুণ অভাবের সময়ও এরা ফেলে ছড়িয়ে তিন বেলা ভাত খায়। এবার কার্তিক মাসেই কারও ঘরে এক দানা চাল নেই। জমি ঠিকঠাক করার সময় এসে গেছে, বীজ ধান দরকার। হালের গরু দরকার। সিরাজ মিয়ার মতো সম্ভ্রান্ত চাষিও তার কিনে রাখা ঢেউ টিন জলের দামে বিক্রি করে দিল।

ঘরে ঘরে অভাব। ভেজা ধান শুকিয়ে যে চাল করা হয়েছে সে চালে উৎকট গন্ধ। পেটে সহ্য হয় না। মোহনগঞ্জ থেকে আটা এসেছে। আটার রুটি কারও মুখে রুচে না। কেউ খেতে চায় না। লগ্নির কারবারিরা চড়া সুদে টাকা ধার দিতে শুরু করল।

ঠিক এই সময় কলেরা দেখা দিল। প্রথম মারা গেল ডাক্তার ফজলুল করিম সাহেবের কম্পাউন্ডারটি। হাতির মতো জোয়ান লোক। দুদিনের মধ্যেই শেষ। তার পরদিনই একসঙ্গে পাঁচজন অসুখে পড়ল। আমিন ডাক্তার দিশাহারা হয়ে পড়ল। ওষুধপত্র নেই। খাবার নেই। কীভাবে কী হবে?

রাতে ঘর বন্ধ করে বসে থাকে সবাই। ওলাওঠার সময় খুবই দুঃসময়। তখন বাইরে বেরুলে রাতবিরাতে বিকট কিছু চোখে পড়তে পারে। চোখে পড়লেই সর্বনাশ।

ডাক্তার ফজলুল করিম সাহেব কলেরা শুরু হওয়ার চতুর্থদিনে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন। আমিন ডাক্তারের কাছে ওষুধপত্র নেই। নিমতলীর সিরাজুল ইসলামের কাছে লোক গিয়েছিল। তিনি আসলেন না। নিমতলীতেও কলেরা লেগেছে। সেখানকার অবস্থা ভয়াবহ। তবে সেখানে সরকারি সাহায্য এসেছে। সোহাগীতে এখনো কেউ আসেনি। কেউ বোধহয় নামও জানে না সোহাগীর।

পঞ্চম দিনে রহিমার ভেদ বমি শুরু হলো। আমিন ডাক্তার ছুটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। করবার কিছু নেই। রোগীর পাশে বসে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কীই-বা করা যায়?

শরিফা রহিমার মাথা কোলে নিয়ে বসে ছিল। নুরুদ্দীন অনুফার হাত ধরে বারান্দায় বসেছিল। শরিফা ডুকরে কেঁদে উঠল, এ-কী সর্বনাশ ডাক্তার!

আল্লাহর নাম নেন, আল্লাহ্ নিকাবান।

রহিমার শরীর খুবই খারাপ হলো মাঝ রাত্রে। শরিফা ধরা গলায় বলল, কিছু খাইতে মন চায় ভইন ?

নাহ।

ভইন আমার ওপরে রাগ রাইখো না।

না, আমার রাগ নাই। তোমরার সাথে আমি সুখেই আছিলাম।

শরিফা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। আমিন ডাক্তার উঠোনের চুলায় পানি সিদ্ধ করছিল। শরিফা বেরিয়ে এসে বলল, এরে নিখল সাব ডাক্তারের কাছে নিলে বালা হইয়া যাইত।

সময় নাই দোস্তাইন। সময়ের অনটন।

রহিমা মারা গেল শেষ রাত্রে। অনুফাকে দেখে মনে হলো না সে খুব বিচলিত হয়েছে। আমিন ডাক্তার বলল, অনুফা বেটি সিদ্ধ পানি দিয়া গোসল কর। সব জামা কাপড় পানির মইধ্যে সিদ্ধকরণ দরকার।

অনুফা কোনো আপত্তি করল না। আমিন ডাক্তার অনুফার মাথায় পানি ঢালতে লাগল। অনুফা ফিসফিস করে বলল, চাচাজি নিখল সাব ডাক্তার আইতাছে।

কী কস তুই বেটি ?

নিখল সাব ডাক্তার এই গেরামে আসতাছে।

সেই একরাত্রে সোহাগীতে মারা গেল ছয়জন। গ্রাম বন্ধন দেওয়ার জন্যে ফকির আনতে লোক গেছে। ফকির শুধু গ্রাম বন্ধনই দিবে না ওলাওঠাকে চালান করে দিবে অন্য গ্রামে। অমাবশ্যার রাত্রি ছাড়া তা সম্ভব নয়। ভাগ্যক্রমে আগামীকাল অমাবশ্যা।

ফকির সাব সকালে এসে পৌঁছলেন। ডাক্তার রিচার্ড এ্যালেন নিকলসন এসে পৌঁছলেন দুপুরবেলা। খবর পেয়ে আমিন ডাক্তার চৌধুরীবাড়ির ভাত ফেলে ছুটে এল।

ভালো আছ আমিন ?

নিখল সাব হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন। বিস্ময়ের চোটে আমিন ডাক্তারের মুখে কথা ফুটল না। ডাক্তার নিখল সাব চুরুটে লম্বা টান দিয়ে বলল, আমরা নিমতলী গিয়েছিলাম সেখানে সরকারি সাহায্য এসেছে, কাজেই তোমাদের এখানে আসলাম। আমাদের আরেকটা টিম গেছে সুখান পুকুর। তোমাদের অবস্থা কী ?

স্যার, খুব খারাপ।

পানি ফুটিয়ে খাচ্ছে তো লোকজন ?

নিখল সাব হাসতে লাগলেন যেন পিকনিক করতে এসেছেন।

নিখল সাব পৌঁছবার পর আর একটিমাত্র রোগী মারা গেল। কৈবর্তপাড়ার নিমু গোঁসাই। এত অল্প সময়ে ওলাওঠাকে আয়ত্ত করার কৃতিত্বের সিংভাগ পেল ধনু

ফকির। ফকির সাব ওলাওঠাকে পশ্চিমদিকে চালান করেছেন। সেই কারণেই শেষ রোগীটা হয়েছে পশ্চিমের কৈবর্তপাড়ায়।

নিখল সাব ডাক্তার শুক্রবার চলে গেলেন। যাওয়ার সময় অনুফাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। অনুফা কোনোরকম আপত্তি করল না। নিখল সাব ডাক্তার বারবার জিজ্ঞেস করলেন, আমিন বলছে তোমার মায়ের ইচ্ছা ছিল তুমি আমার স্কুলে পড়, কি যেতে চাও ?

অনুফা মাথা নাড়ল। সে যেতে চায়।

কাঁদবে না ?

উহুঁ।

নাম কী তোমার ?

অনুফা।

এত আস্তে বলছ কেন ? আমাকে ভয় লাগছে ?

উহুঁ।

নৌকা ছাড়ার ঠিক আগে আগে আমিন ডাক্তার চৌধুরীদের পাগল ছেলেটাকে ধরে এনে হাজির করল। যদি নিখল সাব কোনো চিকিৎসা করতে পারে। নিখল সাব জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম আপনার ?

চৌধুরী জমির আলী।

কী অসুবিধা আপনার ?

জি-না, কোনো অসুবিধা নাই।

রাত্রে ভালো ঘুম হয় ?

জি হয়।

অত্যন্ত শান্ত ভদ্র কথাবার্তা। নিখল সাব ডাক্তার নৌকা ছেড়ে দিলেন। বড় গাঙের কাছাকাছি নৌকা আসতেই অনুফা বলল, নুরু ভাই খাড়াইয়া আছে ঐখানে।

নিখল সাব অবাক হয়ে দেখলেন, নুরুদ্দীন নামের শান্ত ছেলেটা সত্যি দাঁড়িয়ে আছে। এত দূর আসল কী করে ?

নৌকা ভিড়াব ? কথা বলবে ?

নাহ।

যে মেয়েটি সারাক্ষণের জন্যে একবার কাঁদেনি সে এইবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ভাতের কষ্ট বড় কষ্ট।

নুরুদ্দীনের পেটে সারাক্ষণ ভাতের ক্ষিধে লেগে থাকে। শরিফা রোজই বলে, আজরফ টেকাপয়সা লইয়া আসুক দুইবেলা ভাত রানমু।

কোনদিন আইব ?

কবে যে আসবে তা শরিফাও ভাবে। কোনোই খোঁজ নেই। নুরুদ্দীন গয়নার নৌকায় রোজ দু বেলা খোঁজ করে। মাঝে মাঝে চলে যায় লালচাচির বাড়ি।

দুপুরে কী রানছ চাচি ? ভাত ?

না রে। জাউ। খাবি জাউ ? দেই এক বাটি ?

নাহ।

নুরুদ্দীন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, রাইতে ভাত হইবনি চাচি ?

ধুর, ভাত আছে দেশটার মইধ্যে ?

ভাত খাওনের ইচ্ছা হয় চাচি।

লালচাচি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলে, চাইরডা চাউল ঘরে আছে। দিমু ফুটাইয়া ?

আইচ্ছা দেও।

লালচাচি নুরুদ্দীনের কোলে বাচ্চা দিয়ে অল্প কিছু চাল বসায়।

বাচ্চাটা অসম্ভব রুগ্ন। ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে। কিছুতেই তার কান্না সামলান যায় না। লালচাচি শান্তস্বরে বলে, ভাতের কষ্ট বড় কষ্টরে নুরা।

হ।

নতুন ধান উঠলে এই কষ্ট মনে থাকত না।

নুরুদ্দীন খেতে বসে হাসিমুখে বলে, অনুফা তিনবেলা ভাত খায়। ঠিক না চাচি ?

হুঁ।

ফালাইয়া ছড়াইয়া খায়। ঠিক না চাচি ?

হুঁ। নিখল সাবের তো আর পয়সার অভাব নাই।

বিকালের দিকে নুরুদ্দীন তার মাছ মারার সাজসরঞ্জাম নিয়ে বের হয়। বাড়ির পেছনের মজা খালটাতে গোটা দশেক লার বড়শি পাতা আছে। বড়শিগুলির মাথায় জ্যান্ত লাটি মাছ। লাটি মাছের প্রাণ বড় শক্ত প্রাণ, এই অবস্থাতেও সে দশ-বারো ঘণ্টা বেঁচে থাকে। নুরুদ্দীনের কাজ হচ্ছে লাটি মাছগুলি মরে গেল কি না তাই দেখা। মরে গেলে সেগুলো বদলে দিতে হয়। মাছ কিন্তু ধরা পড়ে না। জঙ্গলা ভিটায় এই পরিশ্রম করলে রোজ দুতিনটা মাছ ধরা পড়ত। নুরুদ্দীনের বড় ইচ্ছা করে জঙ্গলা ভিটায় যেতে, সাহসে কুলায় না। একটা ফর্সা হাতের ছবি চোখে ভাসে। হাতভর্তি গাঢ় লাল রঙের চুড়ি। এত লাল চুড়ি হয় নাকি ?

আমিন ডাক্তারের স্কুলে যাওয়াও নুরুদ্দীন বন্ধ করে দিয়েছে। সারা সকাল বসে বসে স্বরে অ স্বরে আ করে চেঁচাতে খুব খারাপ লাগে। এর চেয়ে সরকারবাড়ির জলমহালের কাছে ঘুরাঘুরি করলে কত কী দেখা যায়। জলমহাল এই বৎসর মাছে ভর্তি। পরপর তিন বছর পাইল করা হয়েছে। সাধারণত পানি বেশি হলে মাছ কমে যায়। এই বছর হয়েছে উল্টো। নরহরি দাস বলেছে এত মাছ সে কোনো জলমহালে দেখেনি। নুরুদ্দীন সারা সকাল জলমহালের পাশে বসে থাকে। সরকাররা মাছ ধরার খুব বড় আয়োজন করছেন এই বছর। তাদের ছোট জামাই আসবেন বলে শোনা যাচ্ছে। ছোট জামাই গানবাজনায় খুব উৎসাহী। জামাই এলে নিশ্চয়ই কানা নিবারণকে আনা হবে। দুবছর আগে তিনি যাত্রা গান আনিয়েছিলেন, বৈকুণ্ঠের দল। পালার নাম 'মীনা কুমারী'। তিন রাত যাত্রা হয়েছিল। সেই তিন রাত সোহাগীর কারও চোখে ঘুম ছিল না। ছোট জামাই আসার খবর হলে সোহাগীতে একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করে। এই বার তেমন হচ্ছে না। পেটে ক্ষুধা নিয়ে গানবাজনার কথা ভাবতে ভালো লাগে না।

আজরফ ফিরল আশ্বিন মাসে। শরিফার ধারণা আজরফ খালি হাতে আসেনি। বেশ কিছু টাকাপয়সা নিয়ে এসেছে। তার ধান বিক্রির টাকা আমিন ডাক্তারের কাছে। শরিফা চেয়ে চিন্তে কিছু এনেছে। সেই টাকার প্রায় সবটাই রয়েছে, খরচ হয়নি। শরিফা ভেবেছিল আজরফ আসামাত্র ধান টান কিনবে। খাওয়ার কষ্ট দূর হবে। আজরফ সে রকম কিছুই করছে না। অন্য সবার মতো ঘোরাঘুরি করছে জলমহালে কাজ করবার জন্যে। একদিন শরিফা বলেই ফেলল, টেকাপয়সা কিছু আনছস ?

হুঁ।

কত টেহা ?

আছে কিছু।

ধান টান কিছু কিনন দরকার। নুরা ভাত খাইত পারে না।

এই কয়দিন যখন গেছে বাকি দিনও যাইব।

জমা টেহা দিয়া তুই করবি কী ?

জমি কিনবাম। অভাবের লাগিন হস্তায় জমি বিক্রি হইতাছে।

আজরফ সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে। তাকে ভরসা করে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসও করা যায় না। কখন কী করবে বাড়িতে কিছুই বলে না। আমিন ডাক্তার একদিন এসে বলল, আজরফ, নৌকাডা তো খুব বালা কিনছে দোস্তাইন।

শরিফা আকাশ থেকে পড়েছে। নৌকা কেনার কথা সে কিছুই জানে না।

আজরফ তুইনি নাও কিনছস ?

হুঁ।

কই কিছু তো কস নাই।

কওনের কী আছে ?

সরকারবাড়িতে আজরফ রোজ দুবেলা করে যাচ্ছে যেন জলমহালের কাজের ওপর তার বাঁচা মরা নির্ভর করছে। সরকারদের অনেক লোক দরকার। মাছ মোহনগঞ্জ নিয়ে পৌঁছান, নীলগঞ্জ নিয়ে যাওয়া, মাছ কাটা, মাছ শুকানো—কাজের কি অন্ত আছে ? কিন্তু কাজ পাওয়াটাই হচ্ছে সমস্যা। নিজাম সরকার সোহাগীর লোকদের কাজ না দিয়ে অন্য গ্রামের লোকদের কাজ দিচ্ছেন। এর পেছনে তাঁর একটি নিজস্ব যুক্তি আছে। অন্য গ্রামের লোকদের কাজের সময় একটা কড়া কথা বললে কিছু আসে যায় না। কিন্তু নিজ গ্রামের লোকদের বেলা তা করা যাবে না। এদের সঙ্গে নিত্যদিন দেখা হবে। এরা যদি মনের মধ্যে কিছু পুষে রাখে সেটা খারাপ।

নিজাম সরকার অবশ্যি আজরফকে কাজ দিলেন। মাছের নৌকা নিয়ে নীলগঞ্জ যাওয়া।

রাইতে রওনা হইবা সকালের ট্রেইনের আগে নিয়া পৌঁছাইবা। পারবা তো ?

পারবাম।

তোমারে দেইখ্যা অবশ্যি মনে হয় পারবা। তোমার বাপের বদস্বভাব তোমার মইধ্যে নাই। তোমার বাপ আছে কই ওখন ?

ঢাকা জিলায়। নরসিংদী।

বুঝলা আজরফ, গরুর যে গু তারও একটা গুণ আছে। তোমার বাপের হেইডাও নাই।

আজরফের সঙ্গে আমিন ডাক্তারেরও চাকরি হয়। হিসাবপত্র রাখা। হিসাব রাখার জন্যে মোহনগঞ্জ থেকেও একজনকে আনা হয়েছে। সেই লোক অতিরিক্ত চালাক। আমিন ডাক্তারকে চাকরি দেওয়ার সেটাও একটি কারণ। আমিন ডাক্তার এখন আর ডাক্তারি করে না। যদিও রোগী এখন প্রচুর। কিন্তু টাকাপয়সা কেউ দিতে পারে না। ওষুধ পর্যন্ত বাকিতে কিনতে হয়। আমিন ডাক্তারের ওষুধের বাক্সও খালি। ওষুধ কিনে জমিয়ে রাখবে সেই পয়সা কোথায় ?

আমিন ডাক্তার এখনো খেতে যায় চৌধুরীবাড়ি। চৌধুরীবাড়ির খাওয়া আর আগের মতো নাই। সকালবেলা রুটি হয়। রাতের বেলাতেই শুধু ভাত। বৌটি কুণ্ঠিত হয়ে থাকে।

বড় শরম লাগে এইসব খাওয়াইতে।

না মা না শরমের কিছু নাই।

এরার অবস্থা আর আগের মতো নাই। জমি বিক্রি করতাছে।

কও কী মা ? খাস জমি ?

লেচু বাগানটা বেচতাছে। কিছু খাস জমিও যাইব।

কিনে কে, সরকাররা ?

জি-না। মতি মিয়ার ছেলে আজরফ—সেইরকম শুনতাছি।

বড়ই অবাক হয় আমিন ডাক্তার। সেই রাত্রেই মতি মিয়ার বাড়ি উপস্থিত হয়।

আজরফ জমি কিনতাছস হুনলাম।

জি চাচা।

কস কী রে বেটা।

সবটি টেকা একসাথে দিতাম পারতাম না। দুই বারে দিয়াম।

কত টেকা আছে তর, হেই আজরফ ?

আজরফ যেন শরিফা শুনতে না পায় সেভাবে নিচুস্বরে টাকার অংকটা বলে। আমিন ডাক্তারের মুখ হা হয়ে যায়।

১৪

দীর্ঘদিন মতি মিয়ার কোনো খোঁজ নেই।

শরিফার কান্নাকাটিতে আমিন ডাক্তার নরসিংদীর যাত্রা পার্টির অধিকারীকে একটি চিঠি দিয়েছে। দশদিনের মধ্যে তার উত্তর এসে হাজির। কী সর্বনাশ! মতি মিয়া নাকি তিনশ টাকা চুরি করে পালিয়ে গেছে। আমিন ডাক্তার চিঠির কথা চেপে গেল। শরিফার সঙ্গে দেখা হলেই মুখ কালো করে বলে, চিডির উত্তর তো অখনো আইল না। বুঝলাম না বিষয়ডা।

শম্ভুগঞ্জেও চিঠি লেখা হয়। সেখান থেকেও উত্তর আসে না। কাজকর্মে উজান দেশে যারা গিয়েছিল সবাই ফিরে এসেছে। মতি মিয়ার কথা কেউ কিছু বলতে পারে না। শরিফা খুব চিন্তিত। আজেবাজে স্বপ্ন দেখে। রাতে ভালো ঘুম হয় না। সংসারের কাজকর্মেও মন বসে না। তবুও যন্ত্রের মতো সব কাজ করতে হয়। আজরফ ভর দিয়ে চলার জন্যে লাঠি বানিয়ে দিয়েছে। সেইটি বগলের নিচে দিয়ে সে ভালোই চলাফেরা করতে পারে। রহিমা মারা যাওয়ায় এখন সে কিছুটা নিঃসঙ্গ অনুভব করে। রাগারাগির জন্যেও হাতের কাছে একজন কেউ দরকার। আজরফ এমন ছেলে যাকে দশটা কথা বললে একটার উত্তর দেয়। তার বেশির ভাগ উত্তরই হুঁ হুঁ জাতীয়। আর নুরুদ্দীনের তো দেখাই পাওয়া যায় না। রাতের বেলাও সে মায়ের সঙ্গে ঘুমুতে আসে না। একা একা বাংলা ঘরে শোয়। এইটুকু ছেলের একা একা শোবার দরকারটা কী ? কিন্তু শরিফার কথা কে শুনবে ?

নীলগঞ্জে শনিবার হাট বসে। সেই হাটে মতি মিয়ার সঙ্গে নইম মাঝির হঠাৎ দেখা। নইম মাঝি বেশ কিছুক্ষণ চিনতেই পারেনি। হাত-পা ফোলা ফোলা। মাথার

সেই কোঁকড়ানো বাবরি চুল নেই। মুখভর্তি দাড়ি। খালি গায়ে একটা চায়ের স্টলের সামনে চুপচাপ বসে আছে।

কেডা, মতি ভাই না ?

মতি মিয়া মুখ ঘুরিয়ে নির্লিপ্ত স্বরে বলল, নইম বালা আছ ?

ও মতি ভাই, তুমি এইখানে করডা কী ?

চা খাইলাম। বালা চা বানায়।

শইলডা খারাপ নাকি মতি ভাই ? তুমি না শম্ভুগঞ্জে আছিলা ?

যাত্রার চাকরিডা নাই।

করো কী তুমি ওখন ?

করি না কিছু। গান বান্দি।

বাড়িত যাইতা না ? লও আমার সাথে নাও লইয়া আইছি।

না।

ওখন যাইতা না তো কোনো সময় যাইবা ?

ওখন এট্টু অসুবিধা আছে।

কী অসুবিধা ? বাড়িতে বেহেই চিন্তা করতাছে।

মতি মিয়া খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে থেমে থেমে বলল, একটা শাদি করছি নইম।

নইম মাঝির মুখে কথা সরে না। বলো কী মতি মিয়া। কবে করলা ?

মাস দুই হইল।

তাজ্জব করলা তুমি মতি ভাই।

মতি মিয়া ইতস্তত করে বলল, কেউরে হুনাইও না। তোমার আল্লার দোহাই।

নইম মাঝি কাউকে বলল না, শুধু আজরফকে বলল।

পাঁচ কান করিস না আজরফ, নিজে গিয়া দেখ আগে। তর মারে হুনাইস না। মাইয়ামানুষ বেহুদা চিল্লাইব।

আজরফের কোনো ভাবান্তর হয় না। যথানিয়মে কাজকর্ম করে। তারপর একদিন বাঁশ আর চাটাই দিয়ে রহিমার ঘর ঠিকঠাক করতে থাকে। শরিফার কাছে সমস্ত ব্যাপারটি খুব রহস্যময় মনে হয়। হঠাৎ কাজকর্ম ফেলে ঘরদুয়ার ঠিক করার দরকারটা কী ? নুরুদ্দীনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, ঘর ঠিকঠাক করে যে—বিষয়ডা কী ?

আমি কী জানি ?

তুই গিয়া জিগা।

তুমি জিগাও গিয়া আমার ঠেকা নাই।

শরিফার নিশ্চিত ধারণা হয় আজরফ সম্ভবত বিয়ে করতে চায়। বিয়ে করতে চাওয়াটা দোষের কিছু না, কিন্তু সব কিছুরই তো একটা সময় অসময় আছে। চাইলেই তো আর বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় না ? দেশজুড়ে আকাল। ঘরের মানুষটার কোনো খোঁজ নাই। টাকাপয়সা অবশ্যি আছে। ভালোই আছে। ধান বেচা টাকা, উজান দেশ থেকে নিয়ে আসা টাকা। এদিকে সরকাররাও নিশ্চয়ই ভালো দিচ্ছে। গরুর মতো যে খাটে তাকে দিবে না ? কিন্তু টাকা থাকলেই বিয়ে করতে হবে ?

শরিফা বড়ই চিন্তিত বোধ করে। পরামর্শ করার লোক নেই। রহিমা থাকলে এই ঝামেলা হতো না। একদিন নইম মাঝির বৌ এসে বলল, আজরফরে দেহি চৌধুরীবাড়ির কোনায় কোনায় ঘুরে। এট্টু খিয়াল রাইখ্যো।

কথা সত্যি হলে খুবই ভয়ের কথা। চৌধুরীবাড়ির কোনো মেয়েকে মনে ধরলেও তা মুখ ফুটে বলা উচিত না। শরিফা কায়দা করে জানতে চায় ব্যাপারটা। আজরফকে ভাত বেড়ে দিয়ে হঠাৎ বলে বসে, চৌধুরীবাড়ির মাইয়ার লাখান মাইয়া পাইলে বউ করতাম।

আজরফ নিরুত্তর।

হলদির লাখান শইলের রঙ।

আজরফকে দেখে মনে হয় সে কিছু শুনছে।

চোধুরী বাড়ির ছোড মাইয়াডারে দেখছসনি আজরফ ?

নাহ।

শরিফার ঠিক বিশ্বাস হয় না। বড়ই অস্বস্তি বোধ হয় তার। তারপর একদিন যখন আজরফ হঠাৎ ঘোষণা করে আগামীকাল ভোরে সে নুরুদ্দীনকে নিয়ে নীলগঞ্জে যাবে তার বাবাকে আনতে, তখন সন্দেহ ঘনীভূত হয়। হঠাৎ বাপের খোঁজ বের করে আনবার জন্যে যাওয়া কেন ? আর নুরুদ্দীনের জন্যেই বা নতুন গেঞ্জি কেনা হলো কেন ?

নতুন গেঞ্জির দরকারটা কী ছিল ?

মতি মিয়ার বৌটির নাম পরী।

মেয়েটির বয়স খুবই কম এবং বড়ই রোগা। কথা বলে উজান দেশের মানুষদের মতো টেনে টেনে। নুরুদ্দীন খুব অবাক হলো। সে ভাবতেও পারেনি এরকম আশ্চর্য একটি ব্যাপার তার জন্যে অপেক্ষা করছে। পরী নুরুদ্দীনের হাত ধরে তাকে পাশে বসাল এবং টেনে টেনে বলল, ছোড মিয়ার গালে একটা লাল তিল, দেখছনি কাণ্ড।

গালের লাল তিল যে একটি চোখে পড়ার জিনিস নুরুদ্দীন তা স্বপ্নেও ভাবেনি। তার লজ্জা করতে লাগল।

চা খাইবা ছোড মিয়া ? চা বানাই ? নতুন খেজুর গুড়ের চা।

নুরুদ্দীনের মতো বাচ্চাছেলেকে চা খাওয়াবার জন্যে কেউ সাধাসাধি করে ? তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে লজ্জিত মুখে চোখ ঘুরিয়ে ঘরবাড়ি দেখতে লাগল। দেখার মতো কিছু নেই। ছোট্ট এক চিলতে ঘর। এক প্রান্তে দড়ির একটি খাটিয়ায় কাঁথা বালিশ। ঘরের অন্য প্রান্তে একটি হারমোনিয়ামের ওপর একজোড়া ঘুঙুর। চা বানাতে বানাতে পরী বলল, নাচনিওয়ালি ছিলাম, বুঝছনি ছোড মিয়া। হইলাম ঘরওয়ালি।

মতি মিয়া ধমক দিল, আহ্ কী কও ?

ক্যান, তোমার দরকারডা কী ?

পরী খিলখিল করে হাসতে লাগল।

ফেরবার পথে মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে রইল। তাকে বড়ই চিন্তিত মনে হলো। কিন্তু পরীর ভাব ভঙ্গি খুব স্বাভাবিক। নৌকার অন্যপ্রান্তে নুরুদ্দীনের সঙ্গে সে ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে, ঐটা কোন গ্রাম ? ঘাসপোতা ? ঘাসপোতা আবর কেমুন নাম ?

ভাটি অঞ্চলে পানি কোন সময় হয় ?

তোমরার জঙ্গলা বাড়ির ভিটাতে তুমি নাকি একটা পেততুনি দেখছিলা ? হাতে লাল চুড়ি ? কথাডা সত্য ?

চৌধুরীবাড়ির একটা পুলার নাকি মাথা খারাপ ?

কে ধনী বেশি ? চৌধুরীরা না সরকাররা ?

মতি মিয়া তেমন কোনো কথাবার্তা বলল না। বড় গাঙ থেকে ছোট গাঙে নৌকা ঢুকবার সময় শুধু বলল, জমির কাজকাম শুরু করন দরকার।

আজরফ বলল, আপনে আর যাইতেন না শম্ভুগঞ্জ ?

ধুর গানবাজনা ছাড়ান দিছি। পোষায় না।

আজরফ কিছু বলল না। মতি মিয়া নিজের মনেই বলল, ঘরসংসার দেখন দরকার। গান বাজনায় কি পেট ভরে ? ভাত কাপড়ডা আগে, বুঝছস ?

নৌকা সোহাগীর কাছাকাছি আসতেই মতি মিয়া উসখুস করতে লাগল। আমরা যে আসতাছি তর মায় জানে।

নাহ।

কিছুই কস নাই ?

নাহ।

মাবুদে এলাহি! বড় চিন্তার কথা আজরফ। কামডা ঠিক হইল না। আমি ভাবছি তর মা বোধহয় নেওনের লাগি পাঠাইছে।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে তামাক টানতে লাগল। নৌকা ঘাটে আসামাত্র আজরফকে বলল, আমিন ডাক্তারের সাথে একটা জরুরি কথা আছিল। কথাডা সাইরা আইতাছি, তরা বাড়িত যা। আজরফ কিছু বলার আগেই মতি মিয়া সরকারবাড়ির আমবাগানে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শরিফার স্তম্ভিত ভাব কেটে যেতেই সে চেঁচাতে শুরু করল। সন্ধ্যাবেলাটা কাজকর্মের সময়, তবু তার চিৎকারে ভিড় জমে গেল। এমন ব্যাপার সোহাগীতে বহুদিন হয়নি। মতি মিয়া কোত্থেকে এক মেয়ে নিয়ে হাজির হয়েছে। সেই মাগির লজ্জা শরম কিছু নেই, ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি। শরিফার চিৎকার সম্পূর্ণ অপেক্ষা করে সে ভরসন্ধ্যায় ঘাটে গা ধুতে গেল। হারিকেন হাতে তার পিছুপিছু গেল নুরুদ্দীন। গাঙের পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বলল, আমারে না দেখলে চিল্লানিটা কিছু কমব, কী কও নুরুদ্দীন ?

চিৎকার অবশ্য কমল না। পরী ফিরে এসে দেখে শরিফা নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে। নইম মাঝির বউ তাকে সামলাবার চেষ্টা করছে। পরী বলল, এমন চিল্লাইয়া তো কোনো লাভ নাই। চিল্লাইলে কী হইব কন আপনে ? আমি এই খানেই থাকবাম। আমার যাওনের জায়গা নাই।

শরিফা পরপর দুদিন না খেয়ে থাকল। ঘুন ঘুন করে কাঁদল পাঁচদিন। তারপর রাগ পড়ে গেল। এইসময় পরী সম্পর্কে তার ধারণা হলো মেয়েটি খারাপ না। মতি মিয়ার মতো একটি অপদার্থের হাতে কেন পড়ল কে জানে!

নুরুদ্দীনকে এখন আর লালচাচির কাছে ভাত খেতে যেতে হয় না। পরী শুধুমাত্র নুরুদ্দীনের জন্যেই ভাতের ব্যবস্থা করেছে। অবশ্যি লালচাচি কিছুদিন হলো বাচ্চা রেখে চলে গিয়েছে বাপের বাড়ি। সিরাজ মিয়া আরেকটি বিয়ে করেছে। এই বৌটি বোকাসোকা। বড় আদর করে লালচাচির ছেলেকে। ছেলেটি তবুও রাতদিন ট্যাঁ ট্যাঁ করে। এই বৌটি নুরুদ্দীনকে খুব আদর করে। নুরুদ্দীনকে দেখলেই বলে, লাড্ডু খাইবা ? তিলের লাড্ডু আছে।

নুরুদ্দীন না বললেও সে এনে দেবে। কাজকর্মে সে লালচাচির চেয়েও আনাড়ি। এই বৌটিকেও নুরুদ্দীনের খুব ভালো লাগে।

১৫

সরকারবাড়ির জলমহালে মাছ মারবার জন্যে একদিন সকালে একদল কৈবর্ত এসে হাজির। সর্বমোট সাতটি নৌকার বিরাট একটি বহর। স্থানীয় কৈবর্তরা ধারণাও করতে পারেনি বাইরের জেলেদের মাছ মারার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে স্থানীয় কৈবর্তদের প্রধান নরহরি দাস ছুটে এল। নিজাম সরকার গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমরার কাছে মাছ ধরার বড় জালই নাই। তোমরা মহালের মাছ ধরবা কী দিয়া ?

এইডা কী কথা কইলেন সরকার সাব। মাছ ধরাই আমরার কাম আর জাল থাকত না ? আসল কথাডা কী চৌধুরী সাব ?

আসল কথা নকল কথা কিছু নাই নরহরি। নিজ গেরামের লোক দিয়া আমি কাম করাইতাম না।

আমরা দোষটা কী করলাম। সারা বছর জলমহালের দেখশোন করলাম। এখন পুলাপান লইয়া কই যাই ?

নরহরি দাস হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

বিদেশী কৈবর্ত দলটি রাতারাতি জলমহালের পাশে ঘরবাড়ি তুলে ফেলল। গাবের কষে জাল ভিজিয়ে প্রকাণ্ড সব জাল রোদে শুকাতে লাগল। ওদের মেয়েরা উদোম গায়ে শিশুদের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে এমনভাবে হাঁটাচলা করতে লাগল যেন এই জায়গায় তারা দীর্ঘদিন ধরে আছে। রাতারাতি নতুন বসতি তৈরি হলো। হাঁসমুরগি চড়ছে। গরু দোয়ান হচ্ছে। সন্ধ্যার পর খোলা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে গানবাজনার আয়োজনও হলো। ঢোল বাজতে লাগল মধ্যরাত পর্যন্ত।

নরহরি দাস তাদের সঙ্গে আলাপ করে সুবিধা করতে পারল না। সরকারবাড়ির সঙ্গে নরহরির কী কথা হয়েছিল তা তারা জানতে চায় না। তাদের চার মাসের কড়ারে আনা হয়েছে। মাছের ত্রিশ ভাগ নিয়ে মাছ ধরে দিবে এইটিই একমাত্র কথা। নরহরির যদি কিছু বলবার থাকে তাহলে তা সরকারবাড়ির সঙ্গেই হওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে নয়।

মঙ্গলবার সকালবেলা কৈবর্তদের কুমারী মেয়েরা এলোচুলে জলমহালে নেমে পূজা দিল। পূজার ফলস্বরূপ অসম্ভব মাছ ধরা পড়বে। মাছ মারায় কোনোরকম বিঘ্ন উপস্থিত হবে না। প্রথম যে মাছটি ধরা পড়ল সেটি একটি দৈত্যাকৃতি কাতল। ডালায় সিঁদুর, ফুল এবং কাতলটি সাজিয়ে পাঠানো হলো সরকারবাড়ি। ঘনঘন উলু পড়তে লাগল নতুন কৈবর্তপাড়ায়।

মাছ মারা শুরু হয়েছে পুরাদমে। মাছখলার পাশে একটি চালাঘর তোলা হয়েছে। আমিন ডাক্তার সেখানে খাতা-পেন্সিল নিয়ে সারা দিন বসে থাকে। কৈবর্তরা চিৎকার করে হিসাব মিলায়,

এক কুড়ি— এক
দুই কুড়ি— দুই
তিন কুড়ি— তিন
রাখ তিন। রাখ তিন। রাখ তিন।
চার কুড়ি— চার
পাঁচ কুড়ি— পাঁচ
ছয় কুড়ি— ছয়
রাখ ছয়। রাখ ছয়। রাখ ছয়।

আমিন ডাক্তারের ব্যস্ততার সীমা নেই। কত মাছ ধরা পড়ল, কত গেল, আর কত মাছ পাঠানো হলো খলায়—সহজ হিসাব নয়। নাওয়া-খাওয়ার সময় পর্যন্ত নেই।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা চৌধুরীবাড়ির মতো নয়। খাবার দেওয়া হয় বাংলাঘরে। একটি কামলা এসে ভাত দিয়ে যায়। মোটা চালের ভাত আর খেসারির ডাল। মেয়েরা কেউ পর্দার ফাঁক দিয়ে লক্ষ করে না। এই ব্যবস্থা আমিন ডাক্তারের ভালো লাগে। মেয়েরা কেউ পর্দার ফাঁক দিয়ে লক্ষ রাখছে জানলে তৃপ্তি করে খাওয়া যায় না। এখানে সে ঝামেলা নেই। নিশ্চিত মনে খাওয়া যায়। তবুও প্রতিবারেই খেতে বসার সময় চৌধুরীবাড়ির কথা মনে পড়ে।

শেষদিন যখন খেতে গেল তখন খুব ভালো খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। মাঝখানে চৌধুরী সাহেব এসে খোঁজ নিয়ে গেলেন।

শেষ কয়টা দিন তোমার কষ্ট হইল ডাক্তার, সময়টা আমার খারাপ পড়ছে, কী আর করবা কও।

না না চৌধুরী সাব কী কন আপনি?

কোনোদিন চিন্তাও করছি না আমার বাড়ির অতিথ চাইর পদের নিচে খানা খাইব।

চৌধুরী সাহেব কিছুক্ষণ থেকেই চলে গেলেন। খাওয়া-দাওয়ার শেষে বৌটি যথারীতি মিষ্টি গলায় বলল, পেট ভরছে ডাক্তার চাচা?

আমিন ডাক্তারের চোখে পানি এসে গেল। সে ধরা গলায় বলল, খুব খাইছি মা।

বসেন, পান আনতে গেছে।

আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, অনেক ভদ্রলোক দেখছি মা এই জীবনে, কিন্তু চৌধুরীর মতো ভদ্রলোক দেখলাম না।

বৌটি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। আমিন ডাক্তার যখন চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে, তখন শান্ত গলায় বলল, ডাক্তার চাচা, আমার বিয়ার সময় এরা কিন্তু কয় নাই ছেলেটা পাগল। ছয় বৎসর বিয়া হইছে কিন্তু আমারে বাপের বাড়িত যাইতে দেয় না। আমার বাপ চাচা গরিব মানুষ। তারা কী করব কন?

আমিন ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বৌটি মনে হলো কাঁদছে।

আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, মা আমি খাস মনে দোয়া করতাছি ছেলেটা বালা হইয়া যাইব। মাথার দোষ থাকত না। তুমি দেখবা নিজেই দেখবা।

ঘর থেকে বেরুবার পরপরই পাগল ছেলেটা চেঁচাতে লাগল, এই শালা আমিন চোরা, তরে আইজ খুন কইরা ফাঁসি যাইয়াম। শালা, তর একদিন কী আমার একদিন।

আমিন ডাক্তার জলমহালে ফিরে এসে দেখে তার ঘরে আজরফ বসে আছে।

কীরে আজরফ, কোনো খবর আছে ?

জি-না চাচা। বাজান আবার গেছে গিয়া।

কস কী ? কই গেছে ?

জানি না।

আজরফ চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই আমিন ডাক্তার দেখল আজরফের চোখ ভেজা।

বিষয় কী আজরফ, কী হইছে ?

জমি কিনার লাগিন যে টেকাপয়সা আছিল বাজান সব লইয়া গেছে। পাতিলের মইধ্যে আছিল।

কান্দিস না আজরফ। বেডা মাইনষের কান্দন ঠিক না, চউখ মুছ।

আজরফ শার্টের হাতায় চোখ মুছল।

১৬

নুরুদ্দীনের লার বড়শিতে প্রকাণ্ড একটি রুই মাছ ধরা পড়েছে। লার বড়শিগুলিতে বোয়াল মাছ ছাড়া অন্যকিছু ধরা পড়ে না। এই রুই মাছটার মরণ দশা হয়েছিল। খালের পাশে প্রচণ্ড দাপাদাপি শুনে পরী এগিয়ে দেখে এই কাণ্ড। দুজনে মিলে মাছ টেনে তুলতে পারে না। লার বড়শির টুইন সুতা ছিঁড়ে যাচ্ছে না কেন সেও এক রহস্য। হইচই শুনে শরিফা বেরিয়ে এল। চোখ কপালে তুলে বলল, মাছ কই পাইছস, এই নুরা ?

নুরুদ্দীন হাঁপাচ্ছে, কথা বলার শক্তি নেই।

এই ছেরা মাছ কই পাইছস ?

বড়শি দিয়া ধরলাম।

এই মাছ তুই বড়শি দিয়া ধরছস ? কী কস তুই ?

নুরুদ্দিন জবাব দিল না।

পরী হাসিমুখে বলল, আইজ খুব বালা রান্ধন করবাম। আজরফরে কইয়াম চাইরডা পোলাউয়ের চাউল আনত। কী কস নুরা ?

নুরুদ্দীন সব কয়টি দাঁত বের করে হাসে। শরিফা গলা উঁচিয়ে ডাকে, আজরফ ও আজরফ, উইঠ্যা আয়।

আজরফ সারা রাত নৌকা চালিয়ে মাছ নিয়ে যায় নীলগঞ্জে। দিনেরবেলা পড়ে পড়ে ঘুমায়। ডাকাডাকি শুনে সে বাইরে এসে অবাক, অতবড় মাছ কই পাইছস নুরা ?

লার বড়শি দিয়া ধরছি।

কস কী নুরুদ্দীন!

পরী হাসতে হাসতে বলল, মাছটার কপালে মিত্যু লিখা ছিল, বুঝছ আজরফ ? ওখন যাও কিছু বালা-মন্দ রান্ধনের জোগাড় করো। চাইরডা পোলাওয়ের চাউল আনতা পারবা ?

আজরফ গম্ভীর মুখে বলল, মাছটা নীলগঞ্জে লইয়া যাইয়াম। পনরো টেহা দাম হইবে মাছটার।

নুরুদ্দীন ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, এই মাছ আমি বেচতাম না ভাইসাব!

আমরা অত বড় মাছ দিয়া কী করবাম ? বেকুবের মতো কথা কস। ঘরে একটা পয়সা নাই।

কানকোয় দড়ি বেঁধে আজরফ মাছ গাঙের পানিতে ছেড়ে রাখল। নৌকা ছাড়বে আছরের ওয়াক্তে। যতক্ষণ পারা যায় মাছ জিইয়ে রাখা। নুরুদ্দীন কোনো কথা বলল না। আজরফ আবার যখন কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমাবার আয়োজন করছে তখন নুরুদ্দীন চাপা স্বরে বলল, ভাইসাব মাছ আমি বেচতাম না।

আজরফ বহু কষ্টে রাগ সামলে বলল, এক চড় দিয়া দাঁত ফালাইয়া দিয়াম— এক কথা একশবার কস।

আজরফ আছরের আগে আগে মাছ আনতে গিয়ে দেখে খুঁটিতে বাঁধা মাছ নেই। নুরুদ্দীনেরও কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। ব্যাপারটিতে পরীর হাত আছে বোঝাই যাচ্ছে। আজরফ লক্ষ করল পরী মুখ টিপে হাসছে। আজরফ নীলগঞ্জে যাওয়ার জন্যে যখন তৈরি হচ্ছে তখন পরী বলল, কয়েকটা টেকা রাইখ্যা যাও আজরফ, পুলাপান মাইনষের শখ। গোসা হইও না।

আজরফ কথার উত্তর না দিয়ে বের হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল বালিশের ওপর পাঁচ টাকার একটি নোট।

আমিন ডাক্তার দীর্ঘদিন পর আজ ডাক্তারি করে এল। রোগী নয়া কৈবর্তপাড়ায়। উত্থান শক্তি নেই এক বুড়ি। দুদিন ধরে প্রবল জ্বর। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। আমিন ডাক্তার গিয়ে দেখে বুড়ির যত্নের সীমা নেই। গোটা কৈবর্তপাড়াই বুড়িকে ঘিরে আছে। একজন পায়ের পাতায় প্রাণপণে তেল মালিশ করছে অন্য একজন তার পাখা নিয়ে প্রবল বেগে হাওয়া করছে। আমিন ডাক্তার প্রচণ্ড ধমক দিল পাখাওয়ালা ছেলেটিকে।

নিউমোনিয়া বানাইতে চাস নাকি, অ্যাঁ ?

আমিন ডাক্তার তার ব্যাগ খুলে লাল রঙের দুটি বড়ি পানিতে গুলে খাইয়ে দিল। ওষুধের গুণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক বুড়ি চোখ মেলল দেখতে দেখতে।

কেডা গো ?

এইলা আমিন ডাক্তার। এই দিগরে ইনার মতো ডাক্তার নাই।

বুড়ি ক্ষীণস্বরে বলল, ডাক্তার সাবের শইলডা বালা ?

ওষুধের দাম বাবদ একটাকা ছাড়াও আরও পাঁচটা টাকা তারা রাখল আমিন ডাক্তারের সামনে। আমিন ডাক্তার অবাক।

এক টাকা ভিজিট আমার।

ডাক্তার সাব রোগীর নিজের টাকা। সে আপনেরে দিতে চায়। কাইল সকালে আরেকবার আইস্যা দেখন লাগব।

না কইলেও আসবাম। রোগীর একটা বিহিত না হইলে কি আর ডাক্তারের ছুটি আছে ? ডাক্তারি সোজা জিনিস ?

হৃষ্টচিত্তে বাড়ির পথ ধরল আমিন। পিছে পিছে একজন এল হারিকেন নিয়ে। যার যা কাজ সেটা না করলে কি আর ভালো লাগে ? না, ডাক্তারিটা আবার শুরু করতে হয়। ওষুধপত্র কেনার জন্যে মোহনগঞ্জ যেতে হবে। এবার নিখল সাবকে একটা চিঠি দিলে কেমন হয় ? ডাক্তারের সাথে ডাক্তারের যোগ তো থাকাই লাগে। অনুফার একটা খোঁজও নেওয়া দরকার—কেমন আছে মেয়েটা কে জানে ?

আমিন ডাক্তারের বাড়ির উঠোনে গুটিশুটি মেরে কে যেন বসে আছে। জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার।

কেডা এই খানে ?

আমিন চাচা, আমি।

তুই অত রাইতে কী করস ?

নুরুদ্দীন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কান্দস ক্যান ? কী হইছে ?

আমার মাছটা রাইখ্যা দিছে।

কী রাইখ্যা দিছে ?

মাছ।

আমিন ডাক্তার কিছুই বুঝতে পারল না। হারিকেনের আলোয় দেখল নুরুর সমস্ত গায়ে কালসিটে পড়েছে। ঠোঁট কেটে রক্ত কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে। ডান গাল ডালিমের মতো লাল হয়ে উঠেছে।

এই নুরা কী হইছে ?

আমার মাছটা রাইখ্যা দিছে।

আয়, ভিতরে আইয়া ক দেহি কী হইছে। কান্দিস না।

ঘটনাটি এরকম। নুরুদ্দীন তার রুই মাছ নিয়ে দক্ষিণ কান্দায় উঠতেই নিজাম সরকার তাকে দেখতে পান। নিজাম সরকারের ধারণা হয় মাছটা গত রাত্রে মাছ খলা থেকে চুরি করা। এত বড় একটা মাছ (তাও রুই মাছ) লার বড়শিতে ধরা পড়েছে এটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার ওপর নুরুদ্দীন সারাক্ষণই জলমহালের আশেপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘুরাঘুরি করে।

নিজাম সরকার নুরুদ্দীনকে ধরে নিয়ে যান মাছখলায়। মাছ চুরিতে কারা কারা আছে তা জানবার জন্যে মাত্রার বাইরে মারধোর করা হয়। মারের জন্যে নুরুদ্দীনের কিছু যায় আসে না। কিন্তু মাছটি ফেরত পাবার আশাতেই সে বিকাল থেকে আমিন ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমিন ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলল, যা বাড়িত যা, আমি সরকারবাড়িত যাইতাছি।

মাছটা তারা দিব আমিন চাচা ?

নিশ্চয়। না দিয়া উপায় আছে ? কান্দিস না। বাড়িত যা।

এইখানে বইয়া থাকি চাচা, আপনে মাছটা লইয়া আইয়েন।

নিজাম সরকার আমিন ডাক্তারের কথা শুনে বিরক্ত হলেন। এ-কী ঝামেলা। তামাক টানা বন্ধ রেখে গম্ভীর মুখে বললেন, চোরের যে সাক্ষী হেও চোর—এইডা জানো ডাক্তার ?

সরকার সাব, নুরু চুরি করে নাই।

চুরি করছে না তুমি নিজে দেখছ ?

আমিন থেমে থেমে বলল, সরকার সাব চুরি যে নুরু করছে, হেইডাও তো আপনে দেখেন নাই।

নিজাম সরকার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কড়া গলায় বললেন, বাড়িত যাও ডাক্তার।

সরকার সাব, একটা বড় অন্যায় হইছে অন্যায়টার বিহিত হওন দরকার।

তুমি বড় ঝামেলা করতাছ। যাও বাড়িত গিয়ে ঘুমাও। সকালে আইবা তোমার সাথে কথা আছে।

আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, অন্যায়ের বিহিত না হওন পর্যন্ত আমি যাইতাম না।

কী করবা তুমি ?

আপনের বাড়ির সামনের ক্ষেতটার মইধ্যে বইয়া থাকবাম।

যাও, থাক গিয়া।

নিজাম সরকার আমিন ডাক্তারের স্পর্ধা দেখে অবাক হলেন। ছোট লোকরা বড় বেশি আসকারা পেয়ে যাচ্ছে। শক্ত হাতে এইসব বন্ধ করতে হবে। এশার নামাজের

পর উঠানে এসে দেখেন আমিন ডাক্তার সত্যি সত্যি বাড়ির সামনের ক্ষেতটার মাঝখানে উবু হয়ে বসে আছে। চৌধুরীদের পাগলা ছেলেটাও আছে সেখানে। সে ক্ষণে ক্ষণে চেঁচাচ্ছে, চোরের গুষ্টি বিনাশ করন খুব বেশি দরকার। চৌধুরীবাড়ির কামলারা এসে পাগলটাকে ধরে নিয়ে গেল।

নইম মাঝির বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত টুয়েন্টি নাইন খেলা হয়। নইম মাঝি মাঝরাত্রে খেলা ফেলে দেখতে গেল আমিন ডাক্তারের ব্যাপারটা কতদূর সত্যি। হ্যাঁ আমিন ডাক্তার বসে আছে ঠিকই। তার গায়ে লাল রঙের কোট। কার্তিক মাসের ঠান্ডা হাওয়া বইছে বলেই মাথার উপর ছাতি মেলা হয়েছে।

সত্যি সত্যি বাড়িত যাইতা না ডাক্তার ভাই ?

নাহ।

জার পড়ছে খুব। বিড়ি খাইবা ? চান বিড়ি আছে।

দেও দেখি।

বিড়ি ধরিয়ে নইম মাঝি শান্ত স্বরে বলল, ডাক্তার ভাই বাড়িত গিয়ে ঘুমাও। শীতের মইধ্যে বইয়া থাইক্যা লাভটা কী কও ?

আমিন ডাক্তার কিছু বলল না।

হঠাৎ বিড়ির লালাভ আগুনে নইম মাঝি লক্ষ করল, আমিন ডাক্তার কাঁদছে। সে বড়ই অবাক হলো। নইম মাঝি সেই রাত্রে আর বাড়ি ফিরল না। নয়া কৈবর্তপাড়ায় প্রতি রাতেই ঢোল বাজিয়ে গানবাজনা হয়। আজ আর হলো না।

১৭

নিজাম সরকার কল্পনাও করেননি ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে। একটা আধা পাগলা লোক বাড়ির সামনে ছাতা মাথায় দিয়ে বসে থাকলে কার কী যায় আসে ?

কিন্তু নিজাম সরকার ফজরের নামাজ শেষ করে বারান্দায় এসে দেখেন আমবাগানে দশ-বারোজন লোক জটলা পাকাচ্ছে। আমিন ডাক্তারের গা ঘেঁসে বসে আছে নইম মাঝি। নইম মাঝি নিজাম সরকারকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সালামালিকুম সরকার সাব।

নিজাম সরকার গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। নামাজের পর তিনি উঠোনে বসে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআন শরীফ পড়েন। আজ পড়তে পারলেন না। হনহন করে এগিয়ে গেলেন আমিন ডাক্তারের দিকে।

নইম মাঝি সরকার সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়াল কিন্তু আমিন ডাক্তার বসে রইল। বহু কষ্টে রাগ সামলালেন নিজাম সরকার। থমথমে গলায় বললেন, তুমি এইখানে কী করো নইম ? বেহুদা ঝামেলা করতাছ তোমরা। আমি থানাতে খবর দিয়াম। যাও, বাড়িত যাও।

আইচ্ছা।

নইম মাঝি কিন্তু বাড়ি গেল না। আমিন ডাক্তারের পাশে বসে একটা বিড়ি ধরাল।

জলমহালে গিয়ে সরকার সাহেবের মাথায় রক্ত উঠে গেল। মাছ মারার কোনো আয়োজন নেই। জেলেরা ছেলেমেয়ে নিয়ে রোদ তাপাচ্ছে।

এই বিষয় কী ? আইজ কাজ কাম নাই ?

কৈবর্তদের মুরব্বি ধীরেন্দ্র হাতজোড় করে এগিয়ে এল।

এই ধীরেন কী হইছে ?

আমরারে কইছে আইজ মাছ মারা হইত না।

কে কইছে ?

ধীরেন্দ্র নিরুত্তর।

বলো কে কইছে ?

হাশেম সাব কইছেন।

হাশেম সাব ? ডাক তো হাশেম সাবরে দেখি বিষয়ডা কী ?

হাশেম সাব আমিন ডাক্তারের সঙ্গে মাছের হিসাব রাখে। লোকটি মহাধুরন্ধর। এসেই অবাক হয়ে বলল, আমি আবার কোন সময় কইলাম। ফাইজলামির জায়গা পাও না ? যত ছোটলোকের দল। যাও, কামে যাও।

কার্তিক মাসের শেষাশেষি জমি তৈরির কাজে সবার ব্যস্ত থাকার কথা। কিন্তু সোহাগীর লোকজন সেদিন কেউ কাজে গেল না। সরকারবাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। দুপুরবেলা এলেন চৌধুরী সাহেব। গম্ভীর হয়ে বললেন, ঝামেলাটা মিটাইয়া ফেল নিজাম। লোকটা না খাইয়া আছে।

কী করতে কন আমারে ?

মহাল থাইক্যা একটা বড় মাছ ধইরা মতি মিয়ার বাড়িত পাঠাইয়া দেও। একটা মাছে তোমার কিছু যাইত আইত না।

চৌধুরী সাব নরম হইলে গাঁও গেরামে থাকন যায় না। আইজ একটা মাছ দিলে কাইল দেওন লাগব দশটা।

লোকটা না খাইয়া থাকব ?

আমি কী করতাম তার ? আমি কি তারে কইছি না খাইয়া থাকতে ?

চৌধুরী সাহেব গেলেন আমিন ডাক্তারের কাছে। গায়ে হাত দিয়ে বললেন, ডাক্তার, আইও আমার সাথে চাইরডা ডাইল ভাত খাও। আও দেখি আমার সাথে।

একটা মীমাংসা না হইলে কেমনে খাই চৌধুরী সাব ?

কয়দিন থাকবা এইবায় ? ধরো যদি মীমাংসা না হয় ?

যতদিন না হয় ততদিন থাকবাম।

বিকালের দিকে আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল। কার্তিক মাসে এ রকম বৃষ্টি হয় না কখনো। ছাতা মাথায় দিয়ে আমিন ডাক্তার উবু হয়ে বসে বসে ভিজতে লাগল। নিজাম সরকারের বিরক্তির সীমা রইল না। রাতেরবেলা তাঁর জামাই আসার কথা, সে এসে যদি দেখে এমন একটা অবস্থা সেটা মোটেই ভালো হবে না। অবশ্যি মোহনগঞ্জ থানায় খবর পাঠানো হয়েছে। সন্ধ্যার মধ্যে থানাওয়ালাদের আসবার কথা। এলে ঝামেলাটা চুকে। নিজাম সরকার তামাক টানতে লাগলেন।

সন্ধ্যার আগে আগে ধীরেন্দ্র এসে হাজির। সে নাকি কী বলতে চায়। নিজাম সরকার গম্ভীর মুখে বললেন, কী কইতে চাও ?

ধীরেন্দ্র হাত কচলাতে লাগল। সে একটি বিশেষ কথা বলতে এসেছে। চুক্তি অনুযায়ী যে ত্রিশভাগ মাছ ওদের প্রাপ্য, সেখান থেকে সে পাঁচটা বড় বড় মাছ মতি মিয়ার কাছে পাঠাতে চায়।

নিজাম সরকার গলা ফুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মাছ দিতে চাও ?

আজ্ঞে চাই।

ক্যান ? কারণটা আমারে কও।

কোনো কারণ নাই। ঝামেলাটা মিটাইতে চাই।

ঝামেলা কী ? আর ঝামেলা যদি থাকেই তুমি সেইটা মিটাইবার কে ? তুমি কোন মাতবর ?

ধীরেন্দ্র তবু যায় না। উসখুস করে।

যাও এখন তুমি বিদায় হও।

সন্ধ্যাবেলা বহু লোকজন আবার সামনে এসে জড়ো হলো। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। পশ্চিম আকাশে অল্প অল্প আলো হয়ে থাকায় অস্পষ্টভাবে সবকিছু নজরে আসে। থানাওয়ালাদের এসে পড়া উচিত। কেন এখনো আসছে না কে জানে ? জামাই রাত নটার মধ্যে এসে পড়বে। কী কুৎসিত ঝামেলা।

নিজাম সরকার হঠাৎ করে ঠিক করলেন আমিন ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবেন। আর ঠিক তখনই মাছের খলার একটি দিক আলো হয়ে উঠল। প্রচণ্ড হইচই শোনা যেতে লাগল। নিজাম সরকার দোনালা বন্দুক হাতে নিচে নেমে এসে শুনলেন স্থানীয় কৈবর্তরা লাঠি সড়কি নিয়ে মাছের খলায় চড়াও হয়েছে। খুব কম হলেও দুজনের পেটে সড়কি বিঁধেছে।

রাত বারোটায় মোহনগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এসে আমিন ডাক্তার, নিমাই মাঝি এবং মাবু খাঁকে বেঁধে নিয়ে গেল। কৈবর্তপাড়ায় কোনো পুরুষমানুষ পাওয়া গেল না। সব পুরুষ রাতারাতি উধাও হয়েছে। কোমরে দড়ি বেঁধে আমিন ডাক্তারকে নৌকায় তোলা হলো। ঘাটে কোনো জনমানব ছিল না।

ময়মনসিংহের সেশন জজ দুটি খুন এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নেতৃত্বদানের অভিযোগে আমিন ডাক্তার এবং নিমাই মাঝিকে দীর্ঘদিনের জন্যে জেলে পাঠিয়ে দিলেন।

সোহাগীর দিন কাটতে লাগল আগের মতোই। ঘুরেফিরে আবার বৈশাখ মাস এল। বাঘাই সিন্নির গান গেয়ে ছেলেমেয়েরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চেঁচাতে লাগল,

আইলাম গো যাইলাম গো
বাঘাই সিন্নি চাইলাম গো।

আজরফ বিয়ে করল সুখান পুকুরে। জমিজমা করল। চৌধুরীদের আমবাগান কিনল। ডাক্তার ফজলুল করিম সুখান পুকুরে এসে আবার শেখ ফার্মেসি খুললেন। আবার চলেও গেলেন।

সোহাগীতে প্রাইমারি স্কুল হলো। ছাত্রের অভাবে সেই স্কুল চলল না।

সিরাজ মিয়া আবার আরেকটি বিয়ে করল। সে বৌটি আবার কয়েকদিন পর মরেও গেল। সিরাজ মিয়ার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। জমিজমা বিক্রি করতে লাগল। দিন কাটতে লাগল সোহাগীর। তারপর একসময় আমিন ডাক্তারের কথা কারও মনেই রইল না। এগারো বছর বড় দীর্ঘ সময়।

১৮

আবার কতকাল পরে ফেরা।

সবকিছু কেমন অচেনা লাগে। কিছুই যেন আগের মতো নেই। নতুন নতুন রাস্তাঘাট। নতুন নতুন বাড়িঘর। মোহনগঞ্জ স্টেশনে নেমে আমিন ডাক্তারের চোখ ভিজে উঠল। কত পুরনো জায়গা অথচ কত অচেনা লাগছে।

মোহনগঞ্জ থেকে এখন লঞ্চ যায় নিমতলী, সুখান পুকুর, ঘাসপোতা। গয়নার নৌকা নাকি উঠেই গেছে। লঞ্চে চেপে হুস হাস করে লোকজন চলাফেরা করে। আমিন ডাক্তার লঞ্চের ছাদে চাদর পেতে বসে থাকে চুপচাপ। এই লঞ্চে করেই হয়তো কেউ কেউ যাচ্ছে নিমতলী আর সোহাগীতে অথচ কাউকেই চিনতে পারছে না।

গ্রামের পর গ্রাম পার হচ্ছে। আমিন ডাক্তার তৃষিতের মতো তাকিয়ে থাকে। বর্ষার পানিতে নদী ভরে গিয়েছে। ছেলেরা ঝাঁপাঝাঁপি করছে নতুন পানিতে। ঐ একটি নাইওরীদের নৌকা গেল। বৌটি ঘোমটার ফাঁক দিয়ে অবাক হয়ে দেখছে। আমিন ডাক্তারের চোখ দিয়ে জল পড়ে। বয়স হয়ে মন অশক্ত হয়েছে, অল্পতেই চোখ ভিজে ওঠে।

পেন্নাম হই। আপনে আমিন ডাক্তার না?

আমিন ডাক্তার অভিভূত হয়ে পড়ল। কানা নিবারণ। সেই শক্তসমর্থ শরীর আর নেই। মাথার ভ্রমরকৃষ্ণ কালো চুল আজ কাশফুলের মতো সাদা।

ডাক্তার সাব, আমারে চিনছেন ?

আপনেরে চিনতাম না ? আপনেরে না চিনে কে ?

ভগবান আপনের মঙ্গল করুক। আপনে কিন্তু ভুল কইলেন। আমারে এখন কেউ চিনে না। গান গাই না আইজ সাত বচ্ছর। গলা নষ্ট। হাঁসের মতো শব্দ হয়।

আমিন ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

মতি মিয়া এখন খুব বড় গাতক। চিনছেন ? সোহাগীর মতি মিয়া। নয় খান সোনার মেডেল আছে। রেডিওতে নিয়া গেছিল। মিনিস্টার সাব তার সাথে ছবি তুলছে।

আপনে এখন করেন কী ?

কিছুই করি না ভাই। পুরনো লোকদের সাথে দেখা হইলে তারা টেকাপয়সা দিয়া সাহায্য করে। খুব অচল হইলে মতি মিয়ার কাছে যাই। আমারে খুব খাতির করে।

শইল কেমন আপনের ?

বালা না। হাঁপানি হইছে। সারা জীবন শইলের ওপরে অত্যাচার করছি। শইলের আর দোষ কী ?

কানা নিবারণ হোগলা পোতায় নেমে গেল। হাত ধরে নামিয়ে দিতে গেল আমিন ডাক্তার। টিকিট করা ছিল না। লঞ্চের একটা লোক কী একটা গাল দিয়ে কানা নিবারণের শার্ট চেপে ধরতেই আমিন ডাক্তার উঁচু গলায় বলল, কার সাথে বেয়াদপি করো ? জানো এই লোক কে ? গাতক কানা নিবারণ। ইনার মতো বড় গাতক এই পৃথিবীতে হয় নাই। কয় টেকা ভাড়া হইছে ? আমার কাছ থাইক্যা নেও আর ইনার পাও ধইরা মাফ চাও।

নিমতলী পৌঁছতে পৌঁছতে বিকাল হয়ে গেল। কত পরিচিত ঘরবাড়ি। ঐতো দখিনমুখী বটগাছ। এর নিচেই হাট বসে প্রতি বুধবার। ঐ তো উত্তর বন্দ। এমন ঘন কালো পানি অন্য কোনো হাওরে নেই। বড় মায়া লাগে।

নিমতলী থেকে একটা কেরায়া নৌকা নিল আমিন ডাক্তার। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় পৌঁছবে সোহাগী। শক্ত বাতাস দিচ্ছে, সন্ধ্যার আগেও পৌঁছতে পারে। নৌকার মাঝি নৌকা ছেড়েই জিজ্ঞেস করল, আপনে কেডা গো ? চিনা চিনা লাগে ?

আমি আমিন।

আমারে চিনছেন ?

না, তুমি কেডা ?

আমি কালাচানের ছোড পুলা, বাদশা মিয়া। আপনের কাছে লেহাপড়া শিখছি।

পা ছুঁয়ে সালাম করল বাদশা মিয়া। অনেক খবর পাওয়া গেল তার কাছে। আজরফ একজন সম্পন্ন চাষি এখন। দুটি মেয়ে তার। বড় মেয়ের নাম আতা বানু। ইস্কুলে যায়।

ইস্কুল হইছে নাকি ?

হ চাচা টিনের চালা।

আমিন ডাক্তার চমৎকৃত হয়।

চৌধুরীর খবর কী ?

দুই চৌধুরীই মারা গেছে। পাঁচ ছয় বচ্ছর হয়। বৌটা চৌধুরীবাড়িতেই আছে। মতি চাচার খবর কিছু হুনছেন ?

কিছু কিছু হুনছি।

খুব বড় গাতক হইছে। প্রত্যেক বছর একবার কইরা আসে এইদিকে। গানের রেকর্ড হইছে মতি চাচার—পাঁচ টেকা কইরা দাম।

চৌধুরীর অবস্থা কেমুন এখন ?

খুব খারাপ। জ্ঞাতিরা মামলা মোকদ্দমা কইরা সব শেষ কইরা দিছে।

পুত্রসন্তান তো কেউ ছিল না চৌধুরীর।

আরেকটি আশ্চর্য হওয়ার মতো খবর দিল বাদশা মিয়া। নিখল সাব ডাক্তার অনুফাকে নিয়ে বিলাত চলে গেছেন। যারার আগে অনুফাকে নিয়ে গ্রামে এসেছিলেন। এক রাত ছিলেন আজরফের বাড়ি।

মাইয়াডা কী যে সুন্দর হইছে চাচা আর কী আদব লেহাজ।

তোর বাপের কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে ?

নাহ।

গ্রামে ঢুকবার মুখেই মিনার দেওয়া সুন্দর মসজিদ চোখে পড়ল।

পাকা মসজিদ দিছে কেরে বাদশা ?

সরকার সাবরা দিছে। মৌলভি আছে মসজিদের। জুম্মার দিন মানুষের জায়গা দেওন যায় না। সুখান পুকুর থাইকাও মাইনষে নামাজ পড়তে আইয়ে।

আমিন ডাক্তার মতি মিয়ার বাড়িতে না গিয়ে চৌধুরীবাড়ি উঠল। তাকে অবাক করে দিয়ে চৌধুরী বাড়ির বৌ তার পা ছুঁয়ে সালাম করল। আগের সেই কঠিন পর্দার এখন আর প্রয়োজন নেই।

ভালো আছ মা বেটি ?

ভালো আছি ডাক্তার চাচা।

দীর্ঘ এগারো বছর পর আবার চৌধুরীবাড়ি খেতে বসল আমিন ডাক্তার। কেউ তো তাকে সারা জীবনেও এত যত্ন করে খাওয়ায়নি। বারবার চোখ ভিজে ওঠে। পান হাতে নিয়ে বৌটি আগেকার মতো মিষ্টি গলায় বলল, পেট ভরছে চাচা ?

ভরছে মা। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্।

খাওয়াদাওয়ার শেষে বাইরের জ্যোৎস্নায় এসে বসে থাকে আমিন ডাক্তার।

বৌটি এসে বসে দাওয়ায়, একসময় মৃদুস্বরে বলে, আপনার কথা ঠিক হইছিল চাচা।

কোন কথা ?

আপনে যে কইছিলেন ওর মাথার দোষটা সারব। মরবার এক বচ্ছর আগে সত্যি সারছিল। খুব ভালো ছিল। আমারে নিয়া আষাঢ় মাসে আমার বাপের দেশে বেড়াইতে গেছিল।

বৌটি চোখমুখে একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল, আমারে নিয়া ময়মনসিংহ গেছিল। একটা হোটেলে আছিলাম। বাইস্কোপ দেখলাম ডাক্তার চাচা। আইজ আর চৌধুরীর উপরে আমার কোনো রাগ নাই।

বৌটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কত পরিবর্তন না হয়েছে সোহাগীর। একটা দাতব্য ডাক্তারখানা হয়েছে। সেখানে সপ্তাহে একদিন একজন সরকারি ডাক্তার এসে বসেন। মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করেই এসেছেন। খুব নাকি ভালো ডাক্তার। একফোঁটা দেমাগ নেই শরীরে। গত বছরের বাঘাই সিন্নির সময় ছেলেপুলেদের সঙ্গে মিলে খুব নাচানাচি করেছেন।

শরিফার চলৎশক্তি নেই। বিছানায় রাতদিন শুয়ে থাকতে হয়। অসম্ভব বুড়িয়ে গেছে। কথাবার্তাও অসংলগ্ন।

আমিন ডাক্তার যখন বলল, দোস্তাইন শরীলডা বালা ? শরিফা শূন্যদৃষ্টিতে তাকাল।

আমি আমিন, আমিন ডাক্তার।

শরিফা চিনতে পারল না। খানিকক্ষণ চুপ থেকে চাপা গলায় বলল, এরা আমারে ভাত দেয় না। আমারে না খাওয়াইয়া মারনের ইচ্ছা। আজরফ হারামজাদারে সালিসি ডাইক্যা জুতাপিটা করণ দরকার। আপনে আজরফ হারামজাদারে একটা ধমক দিয়া যান।

দোস্তাইন, আপনে আমারে চিনতে পারতাছেন না ?

আজরফ হারামজাদা ইন্দুরমারা বিষ কিন্যা রাখছে। পানির সাথে মিশাইয়া খাওয়াইতে চায়।

আজরফ মনে হলো আমিন ডাক্তারকে হঠাৎ উদয় হতে দেখে ঠিক সহজ হতে পারছে না। কোথায় উঠছে কোথায় খাচ্ছে কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। নিজের বাড়িতে এসে উঠবার কথাও বলল না। থেমে থেমে বলল, সোহাগীতে থাকবেননি ডাক্তার চাচা ?

আর যাইয়াম কই ক ?

ডাক্তারি কইরা তো আর কামাইতে পারতেন না। সরকারি ডাক্তার আছে এখন। বালা ডাক্তার।

ওখন আর কাজ কামের বয়স নাই আজরফ। শইলডা নষ্ট হইয়া গেছে।

নুরুদ্দীন লম্বাচওড়া জোয়ান হয়েছে। বাপের মতো লম্বা চুল ঘাড় পর্যন্ত এসেছে। আমিন ডাক্তার বলল, তুইও গান গাস নাকি নুরা ?

জি-না চাচা।

জঙ্গলা ভিটার ঘাটে যাস ?

না চাচাজি, ওখন আর যাই না।

আমারে লইয়া একদিন জঙ্গলা ভিটার ঘাটে যাইস।

ক্যান চাচা ?

দেখনের ইচ্ছা হইছে।

এই দীর্ঘ সময়েও জঙ্গলা ভিটার ঘাটের কোনো পরিবর্তন হয়নি। জায়গাটির বয়স বাড়েনি। আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে দেখল সেই ডেফল গাছটি এখনো আছে। নুরুদ্দীন লগি দিয়ে খুন্দা ঠেলছিল।

সে হালকা গলায় বলল, জঙ্গলা ভিটায় মাইট আছে চাচা।

কে কইছে ?

আমার মনে অয়।

খুন্দা এগুচ্ছে খুব ধীরগতিতে। ডেফল গাছের কাছের বাঁকটি পেরুতেই আমিন ডাক্তার বলল, এইখানে তুই একটা মেয়ে মানুষ দেখছিলি। পানির মইধ্যে ভাসতেছিল। হাতের মইধ্যে লাল চুড়ি। তোর মনে আছে ?

নুরুদ্দীন থেমে থেমে বলল, আছে চাচা। স্বপ্ন দেখছিলাম কিংবা চউখ্যের ধান্ধা।

নুরুদ্দীনের অস্বস্তি লাগে। ফ্যাকাশেভাবে হাসে।

তুই ঠিকই দেখছিলি। স্বপ্ন টপ্ন না। আমি এই জিনিসটা নিয়া অনেক চিন্তা করছি। জেলখানাতে চিন্তার খুব সুবিধা আছিলরে নুরা।

নুরুদ্দীন চুপ করে রইল। আমিন ডাক্তার একটা সিগারেট ধরিয়ে কাশতে লাগল। কাশি থামিয়ে শান্তস্বরে বলল, একটা কথা মন দিয়া শুন। মেয়েটার হাতভর্তি আছিল লাল চুড়ি। হাতভর্তি চুড়ি কোন সময় থাকে জানস নুরা ?

নাহ।

যখন নতুন চুড়ি কিনে। যত দিন যায় তত চুড়ি ভাঙে আর কমে। কিছু বুঝতাছস ?

নাহ।

সোহাগীতে সেই বৎসর চুড়িওয়ালী আইছিল শ্রাবণ মাসে। সব মেয়েরা চুড়ি কিনছে। তোর মাও কিনছিল।

নুরুদ্দীন ক্ষীণস্বরে বলল, আপনে কইতেছেন মেয়েডা সোহাগীর ?

হ্যাঁ।

কিন্তু সোহাগীর কোনো মেয়ে তো মরে নাই চাচাজি।

মরে নাই কথাটা ঠিক না নুরা। বানের সময় সরকারবাড়ির একটা বৌ নিখোঁজ হইছিল। কত খোঁজাখুজি করল তোর মনে নাই ?

আছে।

আমিন ডাক্তার চাপাস্বরে বলল, বানটা হইছিল কিন্তু জঙ্গলা ভিটার ঘটনার তিন দিন পরে।

নুরুদ্দীন লগি হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বহুকাল আগে থইরকল গাছ থেকে অসংখ্য কাক কা কা ডেকে উড়ে গিয়েছিল। আজও হঠাৎ চারদিক থেকে কাক ডাকতে লাগল। নুরুদ্দীন হাত থেকে লগি ফেলে দিল। আমিন ডাক্তার শান্তস্বরে বলল, ভয় পাইছস নুরা ?

পাইছি।

ভয়ের কিছু নাই। চল ফিরত যাই।

ফিরবার পথে আমিন ডাক্তার একটি কথাও বলল না। দক্ষিণ কান্দায় নৌকা বেঁধে দুজনে ওপরে উঠে আসল। আমিন ডাক্তার মৃদুস্বরে বলল, একটা খুব বড় অন্যায় হইছে সরকারবাড়িত। একটা মেয়েরে খুন কইরা ফালাইয়া রাখছিল জঙ্গলা ভিটাত। বুঝতাছস তুই নুরা ?

চাচা বুঝতাছি।

আমি ওখন কী করবাম জানস ?

নাহ।

সরকারবাড়ির সামনের ক্ষেতটাত গিয়া বসবাম। বলবাম আপনেরা একটা বড় অন্যায় করছেন। তার বিচার চাই।

আমিন ডাক্তার হেসে উঠল।

এক অপরাহ্নে আমিন ডাক্তার তার ধূলিধূসরিত লাল কোট গায়ে দিয়ে সরকারবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। মানুষটি ছোটখাটো, কিন্তু পড়ন্ত সূর্যের আলোয় তার দীর্ঘ ছায়া পড়ল। সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে বলেই হয়তো সরকারবাড়ির সামনের প্রাচীন জামগাছ থেকে অসংখ্য কাক কা কা করে ডাকতে লাগল।

মাইট — স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলসি। সাধারণত মাটির নিচে পোঁতা থাকে এবং অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন (?) হয়ে থাকে। এরা নিজেরাই চলাচল করতে পারে

খুন্দা : ঘাস কাটা ছোট নৌকা।

দোস্তাইন : বন্ধুর স্ত্রীকে ডাকার জন্যে ব্যবহৃত সম্মানসূচক সম্বোধন।

বাঘাই সিন্নি : নবান্ন জাতীয় উৎসব।

বারাবান্দানী : যারা ঢেঁকিতে পার দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

লারবর্শি — বোয়াল মাছ মারবার জন্যে ব্যবহৃত বড়শি। জ্যান্ত ব্যাং বা টাকি মাছের টোপ দিয়ে এইসব বড়শি সারা রাত পেতে রাখা হয়।

মাছখলা : মাছ শুকানোর জন্যে ব্যবহৃত উঁচু জায়গা।

ফিরাইল — শিলাবৃষ্টির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্যে একশ্রেণীর বিশেষ মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন (?) ফকির।

জিরাতি : ভিনদেশীয় চাষি, যারা চাষ শেষ হলে ধান নিয়ে নিজ দেশে চলে যায়।

কান্দা : বাঁধজাতীয় উঁচু জায়গা (প্রাকৃতিক)।

বন্দ : ফসলের বিস্তীর্ণ মাঠ। ভাটি অঞ্চলের 'বন্দ'গুলি বর্ষায় হাওরে পরিণত হয়।

পাইল করা — মাছ মারা বন্ধ রাখা। সাধারণত জলমহালগুলি দুতিন বছর পাইল করার পর মাছ মারা হয়।

কেরায়া নৌকা : ভাড়া করা নৌকা।

জার : শীত। জার পড়েছে– শীত পড়ছে।

সড়কি : বল্লম।

জালা : বীজতলার ধান।

বাংলাপিডিএফ.নেট
Banglapdf.net